ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত

শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র পাল

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত

প্রথম প্রকাশ— অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং,
নভেম্বর, ১৯৯২ ইং

প্রকাশক— শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র পাল
৯, জেইল-আশ্রম রোড,
ধলেশ্বর, আগরতলা, পঃ ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ— সান গ্রাফিকস,
১৯ লেইক রোড, আগরতলা

মুদ্রণে— শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী,
প্রেসীনা, গণরাজ চৌমুহনী,
আগরতলা, পঃ ত্রিপুরা।

মূল্য— কুড়ি টাকা।

কোন্ পাতায় কি আছে

ভূমিকা

পুরনো তথ্য সম্বলিত একটি বই প্রকাশের জন্য আমার কয়েকজন সহযোগী-সাংবাদিক এবং বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই আমাকে অনুরোধ করে বা পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য বিধায়, ইচ্ছে থাকা সত্বেও, আমি তা এড়িয়ে চলছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক-কালে প্রকাশিত কয়েকটি বই-এর কিছু ভুল বা বিকৃত তথ্য আমাকে বাধ্য করেছে এ-পথে নামতে। অন্যথায়, এই ভুল তথ্যগুলোই, সঠিক তথ্যের অভাবে, ভবিষ্যতে প্রামাণ্য তথ্য রূপে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

এই বই-এর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে যাঁরা আমাকে আগ্রহভরে সাহায্য করেছেন, ত্রিপুরা সরকারের অবসর প্রাপ্ত আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস, সাহিত্যিক ও গবেষক শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত, সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আরও যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, যথাযথ স্থানে তাঁদের নাম আমি উল্লেখ করেছি তাঁদের সকলের জন্যই রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ।

উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরমশ্রদ্ধেয় প্রয়াত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় প্রণীত "রাজমালা" থেকে ত্রিপুর-রাজবংশ, রাজন্যবর্গ এবং রাজ-শাসনের প্রায় সম্পূর্ণ তথ্যই আমি সংগ্রহ করেছি বইটি আমি প্রাপ্ত হই উক্ত নগেন্দ্রবাবুর সৌজন্যে। যে সব তথ্যের ক্ষেত্রে কোন সূত্রের উল্লেখ করিনি, সেগুলো, হয় উক্ত 'রাজমালা', নয়তো আমার নিজস্ব সূত্র বুঝতে হবে। আর আমার নিজস্ব সূত্র হচ্ছে, আমার সম্পাদিত অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'জনকল্যাণ' এবং দৈনিক 'জাগরণ' পত্রিকা।

অনেক চেষ্টা করেও, কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাইনি এবং সেজন্য দিতেও পারিনি। যেখানে দিয়েছি সেখানেও, আমার অসাবধানতা বশতঃ কোন ভুল থেকে গেলে, সুধী ব্যক্তিগণ, আশা করি অনুগ্রহ করে সংশোধনে এগিয়ে আসবেন। তবে সঠিক তথ্য দিতে আমি আমার সাধ্য মতই চেষ্টা করেছি। আর মুদ্রণ-প্রমাদতো কিছু থাকতেই পারে এবং

আছেও। বইটির শেষ ভাগে "কিছু সংশোধন" অধ্যায়ে অন্যান্য বই-এর কিছু ভুল বা বিকৃত তথ্যের এবং আমার এই বই-এর কিছু মুদ্রণ-প্রমাদের সংশোধন দিয়েছি। এই অধ্যায়টি দেখার জন্য পাঠকবর্গের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গবেষক বা ঐতিহাসিকদের কোন সাহায্যে এলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। উল্লেখ্য, মোটামুটিভাবে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সন্নিবেশই আমি এখানে করেছি, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ইতি—

আগরতলা, নিবেদক—

২৩শে নভেম্বর, ১৯৯২ ইং শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র পাল

ত্রিপুর-রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বেদে পুরুরবার নাম প্রসিদ্ধ। তাঁর আয়ু নামে এক পুত্র ছিল। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ যতির বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় দ্বিতীয় পুত্র যযাতি সিংহাসন লাভ করেন। যযাতির দুই বিবাহ। শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র—যদু ও তুর্ব্বসু; আর বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু।

শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতি জরাপ্রাপ্ত হলে এবং সেই জরা সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া আর কেউ নিতে রাজী না হলে, মহারাজ যযাতি পুরুকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন; আর অন্যান্য পুত্রদের পুরুর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দেন। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পশ্চিম দিকে তুর্ব্বসুকে এবং উত্তর দিকে অনুকে তিনি রাজা করে পাঠান। দ্রুহ্যুর অধিকারে অবিভক্ত বাংলা তথা অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও ব্রহ্মভূখণ্ড ন্যস্ত হয়। তিনিই অর্থাৎ দ্রুহ্যুই হলেন ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ।

মহারাজ যযাতি চন্দ্রবংশীয়। তাঁর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুরে। পুরাণের বর্ণনানুসারে এই স্থান প্রয়াগ প্রদেশে গঙ্গার উত্তর তীরে বর্ত্তমান ছিল।

ত্রিপুরা, রাজন্যবর্গ ও রাজ-শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম রাজপাট

ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ দ্রুহ্যু কিরাত দেশ জয় করে কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ স্থলে প্রথমে রাজপাট স্থাপন করেন।

মহারাজ ত্রিপুর, দ্রুহ্যুর পুত্র দৈত্যের ছেলে। ত্রিপুর অত্যাচারী ও নাস্তিক ছিলেন। ক্রোধান্বিত শিবের ত্রিশূলাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। নিজ নাম অনুসারে ত্রিপুর রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা" করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

চতুর্দ্দশ দেবতার প্রকাশ

অরাজক অবস্থা নিরসনে প্রজাদের আবেদনে রাজ্যে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রকাশ হয় স্বয়ং মহাদেবের আদেশে। এই চতুর্দ্দশ দেবতা হচ্ছেন—হব, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী, কুমার, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়।

মহাদেবের বরে ত্রিপুর-রাণীর গর্ভে ত্রিলোচনের জন্ম হয়। মহারাজ ত্রিলোচন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ন ছিলেন। চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার জন্য তিনি পূজারী আনেন সমুদ্রতীরের এক দ্বীপ থেকে। এই পূজারীরাই চন্তাই-দেওড়াই নামে প্রসিদ্ধ। পূজার উদ্বোধন হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে।

বরবক্র (বরাক) তীরে রাজপাট স্থানান্তর করেন ত্রিলোচন-পুত্র মহারাজ দাক্ষিণ—বড়ভাই দৃকপতির কাছে যুদ্ধে পরাজয়ের পর। রাজপাট স্থাপিত হয় খলংমাতে। এই খলংমায় সুদীর্ঘকাল রাজপাট ছিল। দাক্ষিণের ৫২তম পুরুষ পর্য্যন্ত এখানেই রাজত্ব করেন। মহারাজ কুমার মনু নদীর তীরে শ্যাম্বলনগরে নূতন করে রাজপাট স্থাপন করেন।

ত্রিপুরাব্দের প্রচলন

মহারাজ প্রতীত শ্যাম্বল ত্যাগ করে আরও দক্ষিণদিকে বর্ত্তমান ত্রিপুরায় আসেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই সময় থেকেই ত্রিপুরাব্দের প্রচলন। ত্রিপুরায় মহারাজদের রাজত্ব অনুমান ৫৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে।

প্রতীতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ হামতরফা বা যুঝার রাঙ্গামাটি জয় করে সেখানে রাজপাট স্থাপন করেন। প্রায় এই সময় থেকেই উদয়পুর অঞ্চলে রাজধানী স্থাপিত হয়। পরে মহারাজ উদয়মাণিক্য তার "উদয়পুর" নামকরণ করেন নিজের নামানুসারে।

যুঝার উনবিংশ পুরুষ মহারাজ সিংহতুঙ্গের আমলে ভারতে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণণ সেনের পরাজয়ের পর বাংলাও মুসলমানের হাতে চলে যায় এবং গৌড়ে আরম্ভ হয়ে যায় নবাবী আমল।

ত্রিপুরার বীরাঙ্গণা রাণী মহাদেবী

হীরাবন্ত খাঁ নামক জনৈক জমিদারের পরামর্শে প্রবল প্রতাপ গৌড়ের নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। নবাবের ২/৩ লক্ষ সৈন্য দেখে মহারাজ সিংহতুঙ্গ ভয় পেয়ে যান এবং সন্ধির পরামর্শ করতে থাকেন। কথাটা রাণীর কাণে গেলে রাণী মহাদেবী ক্রোধে জ্বলে উঠেন এবং সন্ধিকে ভীরুতা আখ্যায়িত করে নিজে সসৈন্যে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। গৌড়ের সৈন্যরা পালিয়ে গেল, ত্রিপুরা জয়ী হলো এবং হীরাবন্তের জমিদারী মেহেরকুল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

আগরতলা

সিংহতুঙ্গের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ হরিরায় ওরফে ডাঙ্গরফার ১৮ পুত্র ছিল। মহারাজ তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যের শাসনভার ভাগ করে দেন। সেই মতে পুত্র আগরফা পান আগরতলা অঞ্চল। তাঁর নাম থেকেই আগরতলা নামের উৎপত্তি।

মাণিক্য উপাধি

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ ভাগে গৌড়ের নবাবের সঙ্গে মহারাজ ডাঙ্গরফার প্রীতি-প্রণয় ঘটে। তখন গৌড়ের নবাব বখ্‌তিয়ার খাঁ। মহারাজ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্নকে গৌড়েশ্বরের দরবারে পাঠান। রত্নের ব্যবহারে খুসী হয়ে নবাব রত্নকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসান (অবশ্য যুদ্ধে জয় করে) এবং তাঁকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করেন। এর পর থেকেই ত্রিপুরার মহারাজদের মানিক্য উপাধি।

রাজমালা রচনা

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রত্নমাণিক্যের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। বাংলা আক্রমণ ক'রে তিনি জয়ী হন। আরাকান-রাজকেও পরাজিত করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। রাজমালা রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর—দুই পুরোহিত দ্বারা কবিতায় রাজমালা রচনা করান তিনি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে রাজমালা রচনা করা হয়। কুমিল্লার বিখ্যাত ধর্মসাগর তারই কীর্তি। রাজত্বকাল—১৪৩০-১৪৬২ খৃঃ অব্দ ধরা যেতে পারে।

১৪৬৪ খৃ অব্দে ধন্যমাণিক্যের অভিষেক হয়। প্রধান সেনাপতি রায় কাচাগের কন্যা কমলাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। এই কমলাদেবীর নামেই কসবার বিখ্যাত কমলাসাগর। রায় কাচাগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে তিনি (ধন্যমাণিক্য) বহু রাজ্য জয় করেন। খণ্ডল, বরদাখাত, মেহেরকুল গঙ্গামণ্ডল, বগাসার, বেড়ুরা, ভানুগাছ—সবই তিনি জয় করেন। তখন রাজধানী উদয়পুর।

ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রতিষ্ঠা

ধন্যমাণিক্যের অবিনশ্বর কীর্তি হচ্ছে, উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নির্মাণ এবং তাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা। কষ্টি পাথরে গড়া কালিকা মূর্তি। দেবী ত্রিপুরা-সুন্দরী। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫০১ খৃঃ অব্দে। সুবিখ্যাত ধন্যসাগর ধন্যমাণিক্যই খনন করান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৫১১ খৃঃ অব্দে। রাণী কমলাদেবী তাঁর চিতায় সহমৃতা হন।

উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দির

দেবমাণিক্য ও বিজয়মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করান। কাল—১৫২৮ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি। দৈত্যনারায়ণের ছোট ভাই দুর্লভনারায়ণ খুবই অত্যাচারী ছিলেন। মনে হয়, তার নাম থেকেই সোনামুড়ার দুর্লভনারায়ণ গ্রাম।

উদয়পুরের অমরসাগর অমরপুর এবং অমরপুরের অমরসাগর মহারাজ অমরমাণিক্যের কীর্তি। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি রাজা হন। অমরসাগর

উৎসর্গকালে অমরমাণিক্য তাম্রশাসন দ্বারা যে চতুর্দ্দশ গ্রাম উৎসর্গ করেন, তাহাই এখন চৌদ্দগ্রাম নামে পরিচিত।

কৈলাসহরে রাজপাট

অমরমাণিক্যের সময়েই আরাকানপতি মঘরাজ উদয়পুর দখল করেন। সময়টা ষোড়শ শতাব্দির একেবারে শেষ ভাগ। তখন কৈলাসহরে রাজপাট স্থানান্তরিত হয়। পুত্র রাজধরমাণিক্য অতঃপর উদয়পুর উদ্ধার করেন।

রাজধর-পুত্র যশোধর মাণিক্যের আমলে আবার উদয়পুর বেদখল হয়। দিল্লীর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের ফৌজরা তা দখল করে, সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে প্রায় আড়াই বছর দখলে রেখে মোগল সৈন্যরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় মহামারীর ফলে।

কসবার কালীবাড়ী

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের কীর্ত্তি কল্যাণসাগর—যা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের বাড়ীর সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। তার অপর কীর্ত্তি কসবার কালীবাড়ী, সময় সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি। তার নাম থেকেই খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর এবং কসবার কল্যাণসাগর।

রাণী গুণবতীর নামে গুণসাগর, সহোদর ভ্রাতা জগন্নাথের নামে এক মাইল লম্বা জগন্নাথ দীঘী, আর সম্রাট শাহজাহানপুত্র সুজার নামে কুমিল্লার সুজা মসজিদ ও সুজাগঞ্জ বাজার (গোমতীর তীরে) মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের কীর্ত্তি। তাঁর অপর কীর্ত্তি চন্দ্রনাথে চন্দ্রশেখরের মন্দির নির্ম্মাণ। সময়—সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগ।

চাকলে রোশনাবাদ

নবাব সুজাউদ্দীন, রাজপরিবারে বিবাদের সুযোগে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রকে 'চাকলে রোশনাবাদ" আখ্যাদান পূর্ব্বক বার্ষিক ৯২,৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য করে রাজা জগৎমাণিক্যকে (প্রকৃত রাজা নহেন) জমিদারী স্বরূপ প্রদান করেন। সময়, অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম ভাগ।

অনেক দায়-দরবারের পর, বার্ষিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, জমিদারী স্বরূপ মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যকে তা প্রদান

করা হয়। তদবধি ত্রিপুরার মহারাজা বাংলার নবাবের অধীন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হন এবং ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মতাই-এ রাজপাট

মহারাজ জয়মাণিক্য মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে উদয়পুরের দক্ষিণে চলে যান এবং বর্ত্তমান বিলনীয়ার 'মতাই' নামক স্থানে রাজপাট স্থাপন করেন (১৭৩৮-৩৯ খৃঃ অব্দে)।

মহারাজ জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা হরিধন ঠাকুর নবাবের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে তৃতীয় বিজয়মাণিক্য নামে রাজদণ্ড ধারণ করেন। তখন বঙ্গের অধিপতি নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ ; ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন নিবাইস মহম্মদ, আর হোসেন কুলী খাঁ ছিলেন তার সহকারী।

সমসের গাজী

এই সময়ে ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে এক ধুমকেতুর আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ শিক নিবাসী এক মুসলমান প্রজা, সমসের গাজী ক্রমেই দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেন। এক সামান্য রমণীর গর্ভে, জনৈক ফকিরের ঔরসে তার জন্ম।

বিজয়মাণিক্যের (৩য়) মৃত্যুর পর সমসের গাজী নিজেকে চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। পরবর্ত্তীকালে যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে পরাভূত করে রাজধানী উদয়পুর দখল করে নেন এবং নিজেকে ত্রিপুরার অধিপতি বলে ঘোষণা দেন। তবে প্রজাদের হৃদয় জয় করার মানসে ধর্ম্মমাণিক্যের (২য়) পৌত্র বনমালীকে 'লক্ষণমাণিক্য' নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান এবং তাঁর আড়ালে থেকে নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

পরাজিত যুবরাজ কৃষ্ণমণি উদয়পুর ত্যাগ করে পুরাতন আগরতলায় বসবাস করতে থাকেন। সমসের গাজীর অত্যাচার ও দস্যুপণায় প্রজারা আতঙ্ক হয়ে উঠেন। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণমণি মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। তখন নবাব মীর কাশিম।

ন্যায়পরায়ণ মীরকাশেম কৃষ্ণমণিকে ত্রিপুরার অধিপতি বলে ঘোষণা করেন এবং সমসেরকে গ্রেপ্তার করান। বিচারে সমসেরের প্রাণদণ্ড হয় এবং বন্দী অবস্থায়ই তার মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকর হয়। সময়—১৭৬০ খৃঃ অব্দ। বিজয়মাণিক্য ও সমসেরের রাজত্বকাল প্রায় বিশ বছর (১৭৪০—৬০ খৃঃ)।

ইংরেজ-শাসন আরম্ভ

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মহারাজ কৃষ্ণমণি পরাজিত হন। রাজ্যে ইংরেজ পক্ষে রেসিডেন্ট রূপে নিযুক্ত হন লিক সাহেব এবং তিনিই ত্রিপুরায় প্রথম রেসিডেন্ট তাঁর পুরো নাম মিঃ রল্‌ফ্ লিক (Mr. Ralph Leeke)। সময়—১৭৬১ খৃঃ অব্দ। চাকলে রোশনাবাদ শাসনের জন্য তিনি (লিক) চাকলায় বৃটিশ-শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় অবশ্য রাজ-শাসনই বলবৎ থাকে

পুরাতন আগরতলায় চতুর্দ্দশ দেবতা

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় রাজপাট স্থাপন করেন। উদয়পুর থেকে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিগ্রহ ও চতুর্দ্দশ দেবতা নিয়ে এসে এই নূতন রাজপাটে তিনি পুনঃ স্থাপন করেন। সময়—১৭৬১ খৃঃ অব্দ। রাজধানী স্থানান্তর কালে উদয়পুরের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ কুমিল্লায় স্থানান্তরিত করা হয়।

মহারাজ নির্ণয়ে প্রথম বৃটিশ হস্তক্ষেপ

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর (১৭৮৩ খৃঃ অঃ) পরে পরবর্তী মহারাজ নির্ণয়ে প্রথম বৃটিশ হস্তক্ষেপ ঘটে। কারণ, কৃষ্ণমাণিক্য ছিলেন নিঃসন্তান। তার মনোনীত রাজধরকে (২য়) রাজধর মাণিক্য নামে রাজা করতে তৎকালীন বৃটিশ গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুমোদন নিতে হয়। অনুমোদন সাপেক্ষে মহারাণী জাহ্নবীদেবী দুই বৎসরের অধিককাল রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। কুমিল্লার সুবিখ্যাত 'রাণীর দীঘী' এই রাণীরই কীর্ত্তি।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের কীর্ত্তি মোগরার সুবৃহৎ 'গঙ্গা সাগর'। এই দীঘী খননে খরচ হয় মোট ৩৭ হাজার টাকা। সময়—১৮১৩-১৪ খৃঃ অঃ।

আগরতলায় রাজপাট

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বর্ত্তমান আগরতলায় স্থান নির্ব্বাচন, নগর নির্মাণ এবং রাজপাট স্থাপন করেন সময়, ঊনবিংশ শতাব্দির চতুর্থ দশক তাঁর রাজত্বকাল ১৮২৯—৫০ খৃঃ অঃ

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৫০—৬২ খৃঃ অঃ) বড় মহারাণী রাজলক্ষ্মীদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। মধ্যম মহারাণী মুক্তাবলীদেবীর এক পুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র এবং চতুর্থ মহারাণী জাতীশ্বরীদেবীর এক পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র। এই সময়ে রাজগুরু প্রভু বিপিন বিহারী গোস্বামী মহারাজের প্রধান কর্ণধার প্রভু গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত হিংসেবী, একগুঁয়ে এবং প্রজাবর্গের নিকট ভীতিস্বরূপ। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে এই প্রভু গোস্বামী কারারুদ্ধ হন এবং তদবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সহোদর বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২—৯৬ খৃঃ অঃ) প্রথমে ডিফেক্টো রাজা ছিলেন। ইংলণ্ডের প্রিভি-কাউন্সিলের রায়ের (১৮৬৯ খৃঃ) পর ১৮৭০ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় (১২৭৯ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে ফাল্গুন)।

রাজ্যাভিষেকের এক বছর পরে ১২৮০ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যুবরাজ করেন। এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র তদীয় মাতাসহ কুমিল্লা চলে যান। তখন নবদ্বীপচন্দ্রের জন্য রাজকোষ থেকে মাসিক ১২৫ টাকা ভাতা নির্দ্ধারিত হয়।

কীর্ত্তিমান রাজা মহারাজ বীরচন্দ্র

মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন নানাদিকে কীর্ত্তিমান। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যানুরাগী, শিল্পানুরাগী, শিক্ষানুরাগী, গুণগ্রাহী, সমাজ সংস্কারক ও শাসন সংস্কারক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর হৃদয়বিদারক কবিতা—"দেবি! তুমিতো স্বরগপুরে, জানিনাকো কতদূরে ...... ।" উত্তরকালে সবিশেষ প্রশংসিত হয় তাঁর ভগ্ন-হৃদয় কালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের "ভগ্ন-হৃদয়" কলকাতায় প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি এজন্য অভিনন্দন জানান ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র এখান থেকেই।

রাজ্যবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যই প্রথম সরকারের হাতে তুলে নেন। তার আগে স্কুলগুলো ছিল বে-সরকারী উদ্যোগ এবং অল্প-বিস্তর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। তিনিই সতীদাহ তথা সহমরণ-প্রথা বিলোপ করেন। তিনিই প্রথম, শাসনসংস্কার ও শাসনকার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বৃটিশ ভারতের একজন দক্ষ ও প্রবীণ আই সি এস অফিসারকে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে 'দেওয়ান' রূপে নিযুক্ত করেন। তার আগে সেনাপতিগণই ছিলেন মহারাজদের ক্ষমতা, প্রশাসন ও পরামর্শের কেন্দ্রবিন্দু।

সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ত্রিপুরার এই প্রথম প্রশাসক বা দেওয়ানের নাম বাবু নীলমণি দাস, আই সি এস। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট তিনি নিযুক্ত হন। তার যত্নে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলগণের পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই বৃটিশ অনুকরণে আবগারী বিভাগ, ষ্ট্যাম্প সৃষ্টি, দলিল ও রেজেষ্টারীর প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। উদয়পুর বিভাগ তাঁরই সৃষ্টি।

নীলমণিবাবুর কার্য্যকালের পর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহকারী মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। তখন দীনবন্ধু ঠাকুর মন্ত্রী ছিলেন। কুমারগণের শিক্ষার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞ রাধারমণ ঘোষকে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তার আগে কুমারদের শিক্ষার বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস দেওয়ান বা মন্ত্রী নিযুক্ত হন তৎপূর্ব্বে ধনঞ্জয় ঠাকুর ও রায় বাহাদুর মোহিনী মোহন বর্দ্ধন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন। উমাকান্তবাবুর উদ্যোগে ও যুবরাজ রাধাকিশোরের উৎসাহে স্থানীয় ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ইহাই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম হাইস্কুল—নাম "আগরতলা সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়"। (পরিবর্ত্তিত নাম—উমাকান্ত দাসের নামানুসারে "উমাকান্ত একাডেমী")। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে কলকাতায় বীরচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

আগরতলার বর্ত্তমান রূপ অনেকটা মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের (১৮৯৭—১৯০৯) অবদান উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, ভি এম হসপিটেল, উমাকান্ত একাডেমী প্রভৃতি তাঁর আমলেই হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সারনাথ যাত্রাকালে মোটর দুর্ঘটনায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়।

ত্রিপুরার চা-বাগান

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের (১৯০৯—২৩ খৃঃ) কীর্ত্তি স্থানীয় দুর্গা-মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, লালমহল, কুঞ্জবন, প্রসিদ্ধ বিভাগ সমূহে (বর্ত্তমানের মহকুমা) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পায়নের প্রয়োজনে বিদেশী ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ ও তাদের দ্বারা চা-বাগানের পত্তন (৪০টি চা-বাগান ১১ বছরে স্থাপিত হয়) ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী বা দেওয়ান পি কে দাশগুপ্তের পরামর্শেই, রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে চা-বাগানের পত্তন করা হয়।

লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড রোণাল্ডসে—বাংলার এই দুই গভর্ণর বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে আগরতলায় আসেন। বটতলা সংলগ্ন হাওড়া নদীর উপর নির্ম্মিত সেতুর (এখন নেই) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড কারমাইকেল। তাই এর নাম ছিল "কারমাইকেল ব্রীজ"। আর লর্ড রোণাল্ডসের নামে ঘোষিত হয় বটতলা থেকে উত্তরমুখী রাস্তা। ১৯২৩ খৃঃ অব্দে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর সিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে বিদেশ থাকতে হওয়ায় 'কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশন' যোগে রাজকার্য্য পরিচালিত হতে থাকে। ১৯২৮ খৃঃ অব্দের ২৯শে জানুয়ারী মহারাজের রাজ্যাভিষেক মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

শিল্পী, গুণগ্রাহী ও আর্ত্তদরদী বীরবিক্রম

১৯৪১ ইংরেজীর এপ্রিলের প্রথম ভাগে ঢাকা জেলার রাইপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। উদ্বাস্তু হিন্দুরা দলে দলে ত্রিপুরায় আসেন। মহারাজ বীরবিক্রম তাদেরে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, সহরতলীর অরুন্ধতীনগরে কলোনী স্থাপন করে তাদের পুনর্ব্বাসনও দেন। ১৯৪৬ ইং সনের অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরায় আসলে মহারাজ তাদেরও গ্রহণ ও আশ্রয়দান করেন। ১৩০৮

বাংলার (১৯৪১ ইং) ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহারাজ বীরবিক্রম আগরতলায় "রবীন্দ্র জয়ন্তী দরবার" আহ্বান করেন এবং ঐ দরবারে কবিকে "ভারত ভাস্কর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহারাজ বীরবিক্রম শাসনযন্ত্রের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাজসভা, মন্ত্রী পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা, গ্রাম্যমণ্ডলী ইত্যাদি ছিল তাঁর পরিকল্পিত সংস্কার। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে তাঁর সংস্কার কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয়; আর যুদ্ধ সমাপ্তির স্বল্পকাল পরেই ঘটে তাঁর মৃত্যু। আগরতলা সহরের বর্তমান রূপ, মহারাজগঞ্জ বাজার, এম বি বি কলেজ, অরুন্ধতীনগর মহারাজ বীরবিক্রমেরই অবদান।

১৩৫৭ ত্রিপুরার ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৭ ইংরেজীর ১৭ই মে) রাত্রি প্রায় পৌণে নয়টায় আগরতলা রাজভবনে মহারাজ বীরবিক্রম মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই অবসান ঘটে ত্রিপুরার সুদীর্ঘ ১৩৫৭ বছরের রাজতন্ত্রের বা রাজশাসনের।

মুকুটহীন রাজা কিরীট

মহারাজ কিরীট বিক্রমের জন্ম ১লা পৌষ, ১৩৪৩ ত্রিপুরা, (১৯৩৩ ইং) কলকাতার বালীগঞ্জ রাজপ্রাসাদে। ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের (১৯৪০ ইং) ২৬শে অগ্রহায়ণ তাঁর যৌবরাজ্যে অভিষেক হয়।

পিতার মৃত্যুতে মাত্র ১৪ বছর বয়সে কিরীটবিক্রম রাজ্যভার ও জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বল্পকাল মধ্যেই রাজমাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সভাপতিত্বে ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২২শে শ্রাবণ (আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং) রাজকার্য্য পরিচালনার্থ একটি "রিজেন্সী কাউন্সিল" গঠিত হয়। কিছুকাল পরে পরবর্ত্তী ২৭শে পৌষ (১২ জানুয়ারী, ১৯৪৮ ইং) রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভাদেবী কাউন্সিল ভেঙ্গে দেন এবং একক রিজেন্ট স্বরূপ সম্পূর্ণ রাজক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থা চলতে থাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ১৪/১০/১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত। তখন দেওয়ান রঞ্জিত কুমার রায়, আই সি এস।

এক নজরে

প্রথম মহারাজ—যযাতি পুত্র দ্রুহ্য।

শেষ মহারাজ—বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য।

রাজ আমলের প্রথম দেওয়ান—নীলমণি দাস, আই সি এস।

রাজ আমলের শেষ দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী—
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ (লালকর্তা)।

বৃটিশ সরকারের পক্ষে ত্রিপুরায় প্রথম রেসিডেন্ট—মিঃ রলফ্ লিক

শেষ রেসিডেন্ট বা পলিটিকেল এজেন্ট—কুমিল্লার জেলাশাসক।

শেষ মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যু—
১৭ই মে, ১৯৪৭ ইং (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)

রিজেন্ট—মাতামহারাণী কাঞ্চনপ্রভাদেবী।

কাউন্সিল অব রিজেন্সী—মহারাণী কাঞ্চনপ্রভাদেবী (প্রেসিডেন্ট), মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ (ভাইস প্রেসিডেন্ট), মেজর বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা (সদস্য) ও রাজারত্ন সত্যব্রত মুখার্জী, প্রধানমন্ত্রী (সদস্য)

রিজেন্সীর প্রথম দেওয়ান—সত্যব্রত মুখার্জী (রাজারত্ন), আই সি এস।

রিজেন্সীর শেষ দেওয়ান—রঞ্জিত কুমার রায়, আই সি এস।

প্রথম রাজধানী—ত্রিবেগ।

শেষ রাজধানী—নূতন হাবেলী তথা আগরতলা।

মহারাজদের রাজত্বের চূড়ান্ত অবসান—১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ইং।

ত্রিপুরায় মোট রাজত্বকাল—১৩১৪ বছর ৬ মাস।

মহারাজ বীরবিক্রম কর্তৃক ত্রিপুরার ভারতভুক্তির ঘোষণা—
২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ ইং বা তার ২/১ দিন আগে।

ত্রিপুরার চূড়ান্তভাবে ভারতভুক্তি—১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ইং

ত্রিপুরার গণতন্ত্রে উত্তরণ

ত্রিপুরার মহারাজদের শাসন ছিল সেনাপতি-নির্ভর। সেনাপতিরাই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং বুদ্ধি-পরামর্শের কেন্দ্রবিন্দু। কোন কোন ক্ষেত্রে সেনাপতিদের মর্জি বা পছন্দমতই রাজা নিযুক্ত বা মনোনীত হতেন। প্রজাদের কোন অংশই ছিল না রাজকার্যে বা প্রশাসনে। তাদের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধনের কোন চিন্তাও ছিল না প্রশাসনের।

মহারাজ বীরচন্দ্র তার ব্যতিক্রম ঘটান। তিনি সেনাপতি নির্ভর না হয়ে মন্ত্রী নির্ভর হন। প্রজাদের কল্যাণ চিন্তায়ও আত্মনিয়োগ করেন তিনি প্রশাসনকার্যে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার মানসে সুদক্ষ আই সি এস বাবু নীলমণি দাসকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে তিনি দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করেন। তাঁর (নীলমণিবাবুর) উদ্যোগে কিছু শাসন-সংস্কার সাধিত এবং কয়েকটি আইন প্রণীত হয়।

নীলমণি দাসের পরেও মহারাজ বীরচন্দ্রের মন্ত্রীসভা বহাল থাকে। দীনবন্ধু ঠাকুর, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ঠাকুর, রায় বাহাদুর মোহিনী মোহন বর্দ্ধন, রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস প্রমুখ দক্ষ প্রশাসকগণ তাঁর মন্ত্রী-সভায় স্থান পান।

মহারাজ বীরচন্দ্রই প্রথম রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই প্রজাবর্গের শিক্ষার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন বা রাজসরকারে ন্যস্ত করেন। তাঁর আমলেই এবং তাঁর প্রচেষ্টায়ই রাজ্যে পোষ্ট অফিস স্থাপিত হয়।

মহারাজ বীরচন্দ্রের আমলেই, আমার মতে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরি-কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং প্রজাবর্গ প্রশাসনের অংশীদার হন,—তা যত সামান্যই হোক না কেন।

এই ধারা চলতে থাকে পরবর্তী সময়েও। মহারাজ রাধাকিশোর বা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর তার কোন ব্যতিক্রম ঘটাননি। তাঁরাও মন্ত্রীসভার

সাহায্যেই রাজকার্য্য পরিচালনা করেন এবং প্রজাবর্গের কল্যাণ-মানসে কিছু কিছু প্রচেষ্টা নেন। ঠাকুর সম্প্রদায় এবং রাজবাড়ী সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিগণ ছাড়া প্রজাসাধারণের মধ্যে তখনও শাসনকাজে অংশ নেওয়ার কোন চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁধেনি। বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে ঠাকুরলোক ও কর্তাব্যক্তিগণ প্রশাসনে আরও বেশী ক্ষমতা ও অধিকার দাবি করেন।

মহারাজ বীরবিক্রমও মন্ত্রীসভার মাধ্যমেই রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর আমলে ঠাকুরলোক ও কর্তাব্যক্তিগণ আরও কিছু বেশী ক্ষমতার অধিকারী হন। বীরবিক্রম ছিলেন গণমুখী। প্রজানুরঞ্জনের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে ছিল। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল পরিবেশ হয়তো তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল বা প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এ সময়ে জনগণ তথা প্রজাবর্গও অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেন। সীমান্তের ও পাড়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ এ পাড়েও আছড়ে পড়ে; আঘাত হানে যুবমানসে বিপ্লব, বিদ্রোহ সংগ্রাম ও স্বাধীনতার। আশ্রয় বা আত্মগোপনের জন্য অনুশীলন বা যুগান্তরের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের এ পাড়ে ঘন ঘন আনাগোণা। বক্তৃতা-ভাষণ, বুদ্ধি পরামর্শ জনসচেতনতা বা স্বাধিকার লাভের আশা-আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে তুলে। ছাত্র যুবারা স্বাধিকার লাভের মানসে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এতে হাত মেলান — অবশ্য খুবই সঙ্গোপনে।

ভ্রাতৃ সঙ্ঘ

বীর বিক্রমের রাজত্বের সূচনা থেকেই (১৯২৮ ইং) জনজাগরণ একটা মোটামুটি রূপ নেয়। কিছুকালের মধ্যেই গঠিত হয় "ভ্রাতৃসঙ্ঘ"— শচীন্দ্র লাল সিংহ প্রমুখের নেতৃত্বে। বাহ্যতঃ শরীর চর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা খেলার মহড়া চললেও, গোপনে— অন্ধকারে চলতে থাকে বিপ্লব, বিদ্রোহের মহড়া— স্বাধিকার লাভের মহড়া, এই সঙ্ঘের মাধ্যমে। বৃটিশ ভারতের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাও ছিল সঙ্ঘের লক্ষ্য। ছাত্রসঙ্ঘ নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান সমসাময়িক কালেই গড়ে উঠে— একই উদ্দেশ্যে। তবে তাদের মত ও পথ ছিল ভিন্ন।

ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্তাল আন্দোলনে দিশেহারা বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ ইং সনে ঘোষণা দেন 'প্রভিন্সিয়েল অটোনমীর' তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের। তন্মূলে ১৯৩৭ ইং সনে সমগ্র বৃটিশ ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস, 'না-গ্রহণ—না-বর্জ্জন' এর সিদ্ধান্ত নিয়েও এই নির্ব্বাচনে অংশ নেয় এবং খুব ভাল ফল করে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়।

এই স্বায়ত্বশাসনের ঢেউ ত্রিপুরার বুকে প্রবলভাবে আঘাত হানে। চাগিয়ে তুলে জনমনে স্বায়ত্বশাসন বা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার আশা-আকাঙ্খা। গঠিত হয় "ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ"—দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা অর্জ্জনের লক্ষ্যে—শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, রমেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য. হরিগঙ্গা বসাক, তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, নীলু মুখার্জ্জী প্রমুখ কংগ্রেস-মনোভাবাপন্ন সংগ্রামীদের নেতৃত্বে—১৯৩৮ ইং সনে। ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রকাশ্য দাবী—এই সময় থেকেই।

জনমঙ্গল সমিতি

কিছুকাল পরেই গঠিত হয় "জনমঙ্গল সমিতি"—ঐ একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দায়িত্বশীলশাসন ব্যবস্থার দাবীতে, তখনকার অ-কংগ্রেসী অ-কম্যুনিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে—১৯৩৮ ইং সনের শেষভাগে (অথবা ১৯৩৯ ইং সনের প্রথম ভাগে)। এর নেতৃত্বে ছিলেন পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মা. অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর) ও ঠাকুর প্রভাত চন্দ্র রায়।

এখানে উল্লেখ্য, বৃটিশ ভারতের দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার দাবী, আর ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার দাবীর মধ্যে একটু তফাৎ ছিল। বৃটিশ ভারতের দাবী ছিল—ইংরেজ শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু ত্রিপুরার দাবীতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ছিল না। রাজতন্ত্র বহাল রেখেই, রাজার অধীনেই দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার দাবী ছিল ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ বা জনমঙ্গল সমিতির। অবশ্য, দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতিও ছিল তখন এরকম-ই।

বীরবিক্রমের চিন্তাধারা

বহুদর্শী ও দূরদর্শী মহারাজ বীরবিক্রম বুঝতে পারলেন, শাসন ক্ষমতায় প্রজাদের, কোন না কোন ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতেই হবে। অন্যথায়, অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তাই ১৯৩৮ ইং সনে তিনি নিম্নোক্ত-ভাবে শাসন-যন্ত্রের ঘোষণা সংস্কার করেন,—রাজসভা বা প্রিভিকাউন্সিল, মন্ত্রী পরিষদ ব্যবস্থাপকসভা ও গ্রাম্য-মণ্ডলী।

ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার ও ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্যকারী হবে রাজসভা। রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে মন্ত্রী-পরিষদের উপর আইন প্রণয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে ব্যবস্থাপকসভা (বর্ত্তমান যুগের বিধানসভা বা সংসদ)। আর গ্রাম্যমণ্ডলী গঠিত হবে গ্রাম্য-স্বায়ত্বশাসন পরিচালনার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য গ্রামমণ্ডলী গঠন ছাড়া, আর কিছুই করে উঠতে পারেন নি তিনি। আর যুদ্ধ শেষেই তাঁর পরলোক প্রাপ্তি। আরও জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক করার লক্ষ্যে ১৯৩৮ ইং সনে ত্রিপুরার মিউনিসিপ্যাল আইনও মহারাজ সংশোধন করেন।

জনশিক্ষা সমিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসনের দাবী কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও, যুদ্ধের শেষটায় আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। সুধন্য দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা হেমন্ত দেববর্ম্মা প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে উঠে 'জনশিক্ষা সমিতি'—১৯৪৫ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে, দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সমাবেশে উদ্দেশ্য—স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে উপজাতি জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। সামাজিক বা শিক্ষামূলক কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপও তাঁরা ব্যাপকভাবে চালান।

প্রজামণ্ডল সমিতি

স্বাধিকার বা দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে কম্যুনিষ্টদের পরোক্ষ নেতৃত্বে গঠিত হয় আর একটি মঞ্চ—"প্রজামণ্ডল সমিতি"—১৯৪৬ ইং সনের প্রথম ভাগে। এর সভাপতি পদে বৃত হন ঠাকুর যোগেশচন্দ্র দেববর্মন। বীরেন

দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কানু সেনগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য।

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ

১৯৪৮ ইং সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে (সম্ভবতঃ মে মাসের শেষভাগে) দশরথ-সুধন্য-অঘোর-হেমন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত হয় "ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ"—সদর উত্তরের লেফুঙ্গায় (দশরথবাবুর মতে রাজঘাটে) উপজাতি-দের এক বিশাল সমাবেশে। দশরথ দেব এর সভাপতি এবং অঘোর দেববর্মা এর সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। উদ্দেশ্য সেই দায়িত্বশীল শাসন এবং শাসন ক্ষমতা থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন। প্রথমাবস্থায় এবং পরে দায়িত্বশীল শাসনই এর মূল দাবী থাকে। ১৯৪৮ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট পরিষদের নেতৃ-বৃন্দ এক বিশাল মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে আগরতলা শহরে 'দাবী-দিবস' পালন করেন।

কিন্তু, কিছুকাল পরেই নেতৃবৃন্দ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান এবং দায়িত্ব-শীল শাসনের পরিবর্ত্তে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' দাবী করেন। দশরথবাবুর নেতৃত্বে একটি পাল্টা সরকারও গঠিত হয় পাহাড়ে। অনেক খুন-জখম, লুটতরাজ, অত্যাচার-নিপীড়নের পর ১৯৫১ ইং সনের মাঝামাঝি আবার তাঁরা ভারতীয় শাসন-কাঠামোর মূল স্রোতে ফিরে আসেন এবং আবারও ত্রিপুরায় দায়িত্ব-শীল শাসনের দাবী তুলেন।

ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ

ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীর এটি আর একটি মঞ্চ—সর্ব্বদলীয় মঞ্চ। দলমত নির্বিশেষে, দায়িত্বশীল শাসন লাভের তাগিদে সবাই এই মঞ্চের সামিল হন। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং বিশিষ্ট নির্দল ব্যক্তিবর্গ এতে যোগ দেন। অন্যতম উদ্যোক্তা অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশীঠাকুর), প্রভাত রায়, বীরেন দত্ত ও জিতেন পাল। মঞ্চটি গঠিত হয় ১৯৫১ ইং সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, আগরতলা দরবার মাঠের (বর্ত্তমানের শিশু উদ্যান) এক বিশাল সমাবেশে—লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি নিবারণচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে। বক্তারা ছিলেন প্রভাত রায়, বংশীঠাকুর, জিতেন পাল, বীরেন দত্ত, অনিল

চক্রবর্ত্তী, বীরচন্দ্র দেববর্মা, সরোজ চন্দ, বীরবল্লভ সাহা, রমণী দেবনাথ, প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী সহ আরও অনেকে।

জন্মলগ্ন থেকে সারা বর্ষব্যাপী (১৯৫১ ইং) গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ গণতন্ত্রের দাবীতে, দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে বহু মিছিল-মিটিং-সমাবেশ করে পাহাড়ে-সমতলে, হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান, পাহাড়ী বাঙ্গালীর সহযোগিতায়। দুইটি বড় সমাবেশ হয় আগরতলায় এবং খোয়াই-এ যথাক্রমে ১৫/৮/৫১ ইং ও ১৬/৮/৫১ ইং।

নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সম্মেলন

জিতেন পাল, নিবারণ ঘোষ, ফণীন্দ্র প্রসাদ শূর (উদয়পুর), হেমচন্দ্র নাথ প্রমুখের উদ্যোগে ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের এক বিরাট সম্মেলন হয় ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ইং আগরতলায় দরবার মাঠে (শিশু উদ্যানে) অনুষ্ঠিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর প্রকাশ্য সভায় প্রথম প্রস্তাবটিই গৃহীত হয় ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী করে। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা 'ভারত'-এর সম্পাদক মাখনলাল সেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতি এই দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে সারা ত্রিপুরায় অনেক মিছিল-মিটিং করে।

ইলেকটরেল কলেজ

সাত লক্ষ লোকের অন্তরের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারত সরকার ত্রিপুরার জন্য ত্রিশ আসন বিশিষ্ট ইলেক্টরেল কলেজ তথা নির্ব্বাচক মণ্ডলী গঠনের জন্য ঘোষণা দেন এবং প্রথম লোকসভার নির্ব্বাচনের সঙ্গে ইলেক্টরেল কলেজের নির্ব্বাচনও ঘোষণা করেন। গণতন্ত্রকামী জনতা তাতে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে—প্রতিবাদ করে মিটিং-মিছিল করে। তবে, সব দলই শেষ পর্য্যন্ত নিবাচনে অংশ নেয়।

কংগ্রেস এককভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কম্যুনিষ্ট পার্টি করে জোট বেঁধে—গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ ও কিছুসংখ্যক নির্দ্দলকে সঙ্গে নিয়ে। নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হয় ১৯৫২ ইং সনের জানুয়ারী মাসে—মোট চারদিনে।

নির্বাচনী ফল :— কম্যুনিষ্ট জোট—১৭ (কম্যুনিষ্ট পার্টি—১২, গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ—৩, সমর্থিত নির্দ্দল—২), কংগ্রেস—৯ এবং নির্দ্দল—৪।

এই নির্ব্বাচক মণ্ডলীর একমাত্র কাজ হচ্ছে, ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা। এই ব্যবস্থায় কেউ সন্তুষ্ট হন নি ; না রাজনৈতিক দলগুলো, না বিশিষ্ট গণতন্ত্রকামী ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং আন্দোলন চলতে থাকে জোরকদমে। দশরথবাবুরা প্রকাশ্যে আসায় এবারের আন্দোলন আরও জোরদার হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ

বছর খানেক বাদে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন ত্রিপুরার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ। উপদেষ্টারা প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দিবেন চীফ কমিশনারকে, অথবা চীফ কমিশনার তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৩ ইং গঠিত হয় তিন সদস্যক উপদেষ্টা পরিষদ। উপদেষ্টারা হলেন—শচীন্দ্রলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত ও ঠাকুর জিতেন্দ্র মোহন দেববর্ম্মন। তাঁদের শপথ গ্রহণ করান হয় কুঞ্জবন প্রাসাদে।

আঞ্চলিক পরিষদ

পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ছাড়া ত্রিপুরার অধিবাসীবৃন্দ কোন মতেই খুসী নন। সুতরাং আন্দোলন চলতে থাকে পুরোদমে—সংসদের বাইরে ও ভেতরে। ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ, নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি, ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ এবং রাজনৈতিকদলগুলো বিধানসভা সহ দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলে।

বছর দুই বাদে ১৯৫৬ ইং সনে ভারত সরকার ত্রিপুরার জন্য ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেন। চীফ কমিশনারী শাসন পুরোপুরি বহাল রেখেই আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। এর ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটি অপেক্ষা সামান্য বেশী। চীফ কমিশনারই থাকবেন রাজ্যের সর্বেসর্ব্বা। সাধারণ ছোটখাট কাজ, গ্রাম-গঞ্জের বাজার ও রাস্তাঘাট, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, খেয়া, খোয়াড় ইত্যাদির দায়িত্ব
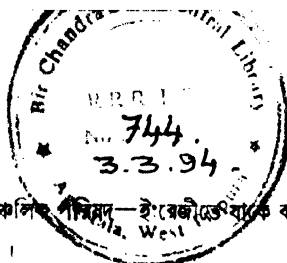
পাবে আঞ্চলিক পরিষদ—ইংরেজীতে যাকে বলা হবে "ত্রিপুরা টেরিটরিয়েল কাউন্সিল"।

১৯৫৭ ইং এর ফেব্রুয়ারীতে আঞ্চলিক পরিষদের নির্ব্বাচন হয়। নির্ব্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে ১৫টি আসন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি তার জোট সহ ১৫টি আসন লাভ করে। কংগ্রেস নেতা শচীন্দ্রলাল সিংহ নির্ব্বাচিত হন চ্যায়ারমেন। পাঁচ বছর পরে ১৯৬২তে আবার আঞ্চলিক পরিষদের নির্ব্বাচন হয় এবং তাতে কংগ্রেস ১৮টি, আর কম্যুনিষ্ট জোট ১২টি আসন পায়। চ্যায়ারমেন নির্ব্বাচিত হন আবারও শচীন্দ্রলাল সিংহই। পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন দাবীর আন্দোলন তখনও চলছেই।

স্বল্প দায়িত্বশীল বিধানসভা

কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঘোষণায় এই নির্ব্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়—১লা জুলাই ১৯৬৩ ইং থেকে। তবে পূর্ণ দায়িত্বশীল বিধানসভা নয়। শচীন্দ্রলাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ নেন। সুখময় সেনগুপ্ত হন উন্নয়ন মন্ত্রী। মনীন্দ্রলাল ভৌমিক, ডাঃ বি দাস এবং রাজপ্রসাদ চৌধুরী—এই ৩ জন হন উপমন্ত্রী। শপথ বাক্য পাঠ করান চীফ কমিশনার এস পি মুখার্জী। ১৯৬৭ ইং সনে এই বিধানসভারই নির্ব্বাচন হয়। কংগ্রেস তাতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ত্রিশটি আসনের মধ্যে সাতাশটিই পায় কংগ্রেস। দুটি সি পি আই (এম), আর একটি সি পি আই পায়।

শচীন্দ্রলাল সিংহ আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা হলেন—তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, রাজপ্রসাদ চৌধুরী, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল দাস। মনসুর আলী হন উপমন্ত্রী। শপথ বাক্য পাঠ করান চীফ কমিশনার ইউ এন শর্ম্মা।

পূর্ণ দায়িত্বশীল বা পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা

১৯৭২ ইং সনের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করে—সুদীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর নিরলস সংগ্রামের পর। ঐদিন মানে ঐ ২১শে

জানুয়ারী আসাম রাইফেল মাঠে আয়োজিত এক বিরাট জনসমাবেশে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য তথা পূর্ণদায়িত্বশীল শাসন লাভের ঐতিহাসিক ঘোষণাটি দেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা ভারতের একুশতম রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ রাজ্যপাল বি কে নেহরু—যিনি কিছুক্ষণ আগেই পূর্ণরাজ্য ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

ঘোষিত হয় ৬০ সদস্যের বিধানসভা। সুখময় সেনগুপ্তকে নেতৃপদে বরণ করে নির্ব্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় কংগ্রেস। নির্ব্বাচন হয় ১১ই মার্চ্চ, ১৯৭২ ইং। কংগ্রেস মোট ৪১টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তার সহযোগী দল সি পি আই পায় একটি আসন। বাকী ১৮টি আসন পায় সি পি আই (এম), তার সমর্থিত দুই নির্দ্দল সহ।

পরবর্তী ২০শে মার্চ্চ মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন কংগ্রেস নেতা সুখময় সেনগুপ্ত। শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল বি কে নেহরু। তিনিই (সুখময়বাবুই) পূর্ণরাজ্য ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরা হলেন – হরিচরণ চৌধুরী, মনোরঞ্জন নাথ, দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ও ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস। আর উপমন্ত্রী হলেন, শৈলেশ সোম, মনসুর আলী ও বাসনা চক্রবর্তী।

১৯৭৫ খৃঃ অব্দে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ও কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যকে মন্ত্রীসভায় পূর্ণ মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বের উপমন্ত্রীত্রয়— শৈলেশ সোম, বাসনা চক্রবর্ত্তী ও মনসুর আলী উন্নীত হন রাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে। আর নতুন করে হংসধ্বজ দেওয়ান শপথ নেন উপমন্ত্রী হিসেবে।

* * *

ত্রিপুরায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

মিউনিসিপ্যালিটি

মহারাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরায় স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের প্রবর্তন করেন আগরতলায় মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর প্রচেষ্টায়ই স্থাপিত হয়। স্থাপনাকাল—১৮৭১ খৃঃ অব্দ। প্রথম চেয়ারম্যান—ত্রিপুরায় বৃটিশ-ভারতের পলিটিকেল এজেন্ট (সূত্র—'শতাব্দির ত্রিপুরা', রমাপ্রসাদ দত্ত)। তখন কোন আইন বা নিয়মবিধি ছিল না। এলাকাও ছিল রাজবাড়ী সংশ্লিষ্ট।

পরবর্ত্তীকালে সাধারণ কাজকর্ম্ম পরিচালনার জন্য একটা নিয়মবিধি তৈরী হয়। ১৯১২ খৃঃ অব্দে তার কিছু সংশোধন হয়। কিন্তু রাজ পরিবার বা রাজ-সরকার থেকে তখনও মিউনিসিপ্যালিটি বেরিয়ে আসতে পারেনি রাজার ইচ্ছাই ছিল সব। চেয়ারম্যানরা ছিলেন রাজার বা রাজ-মন্ত্রীর মনোনীত এবং সবাই রাজ-কর্মচারী বা রাজ-পরিবার সংশ্লিষ্ট।

অনেকদিন সদর-কালেক্টার পদাধিকার বলে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। জন-স্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ায় চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়—১৯০৫ খৃঃ অব্দে। এই সুবাদে তৎকালীন সি এম ও ডাঃ মণিময় মজুমদার অনেকদিন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

মহারাজ বীরবিক্রম প্রজাবর্গকে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ-কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ও আয় বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন। তন্মূলে ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের কিছুটা অনুকরণে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল আইন তৈরী হয়.—পরবর্ত্তীকালে যা ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইন নামে পরিচিতি লাভ করে।

উক্ত আইনে আগরতলাকে ৬টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং কমিশনারের সংখ্যা করা হয় ১২ জন। প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন কমিশনার নির্ব্বাচিত হবেন; আর বাকী ৬ জন হবেন রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক মনোনীত। কমিশনাররা

চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করবেন। আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে হোল্ডিং প্রতি বার্ষিক ৬ (ছয়) টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য্য হয়।

বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থাতেও আগরতলা পুরসভা রাজ-সরকারের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। রাজ-সরকার বা রাজ-মন্ত্রী মনোনীত কমিশনাররাই চেয়ারম্যান-ভাইসচেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হতে থাকেন। মহারাজকুমার আদিত্যকিশোর দেববর্ম্মন, সদর কালেক্টার নরেশ কুমার ভট্টাচার্য্য, কুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মন, উকীল আরমান আলী মুন্সী—তারাই হলেন পরবর্ত্তীকালের চেয়ারম্যান। এই আইনের শেষ চেয়ারম্যান উকীল আরমান আলী মুন্সী এবং ভাইস চেয়ারম্যান ক্ষিতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী (১৯৫১ ইং, নভেম্বর মাসের নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত)।

রাজ্যের দ্বিতীয় চীফ কমিশনার করুণা কুমার হাজরা, আই সি এস আগরতলা পুরসভার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের মানসে, তার আয় বৃদ্ধি, এলাকা বৃদ্ধি ও সম্পূর্ণ জন-প্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। তদনুসারে, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্টের প্রায় অনুকরণে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এক্ট সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। ১৯৫১ ইং সনের এপ্রিলে বলবৎ হয় এই আইন। এই আইনে সহরকে মোট ৬টি ওয়ার্ডে ভাগ করে কমিশনার সংখ্যা করা হয় ১৮ জন এবং সকলেই হবেন নির্ব্বাচিত।
ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিশনার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১নং ওয়ার্ড (রামনগর-জয়নগর)—২ জন; ২ নং ওয়ার্ড (কৃষ্ণনগর) — ৩ জন; ৩নং ওয়ার্ড (মেলারমাঠ, খোসবাগ, অফিস লেন, মন্ত্রীবাড়ী রোড) —৩ জন; ৪নং ওয়ার্ড (শকুন্তলা রোডের পূর্ব্ব, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোডের দক্ষিণ, থানা রোডের পশ্চিম সহ সম্পূর্ণ বাজার এলাকা)—৪ জন; ৫ নং ওয়ার্ড (রাজবাড়ী ও তৎ উত্তর এবং পূর্ব্বদিকস্থ বনমালীপুর এলাকা)—১ জন এবং ৬ নং ওয়ার্ড (ধলেশ্বর, শিবনগর ও কলেজটীলা এলাকা)—৫ জন।

এই আইনে প্রথম নির্ব্বাচন হয় ১৯৫১ ইং সনের নভেম্বর মাসে। ভোট হয় ৫ই নভেম্বর। মোট প্রতিদ্বন্দ্বী—৪১ জন। পক্ষ—৩; করদাতা সমিতি, সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লক (ইউ পি বি) ও ব্যবসায়ী সংঘ। তাছাড়া

ছিলেন নির্দ্দল প্রার্থীরা। কংগ্রেস করদাতার আড়ালে এবং বামেরা ইউ পিঃ বিঃ'—এর আড়ালে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। করদাতা সমিতি প্রার্থী দেয় ১৭ জন ; আর ইউ পি বি দেয় ১৬ জন। ৫ নং ওয়ার্ডের নির্দ্দল প্রার্থী অমরেন্দ্র দেববর্ম্মার (বংশী ঠাকুর) বিরুদ্ধে কোন পক্ষই প্রার্থী দেয়নি এবং তিনি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

অবশিষ্ট ১৭টি আসনের মধ্যে করদাতা পায় ১১টি, ইউ পি বি ২টি, ব্যবসায়ী সঙ্ঘ ১টি এবং নির্দ্দলরা পান ৩টি। পুরসভা করদাতা সমিতির দখলে যায় এবং সুখময় সেনগুপ্ত ১৫—১ ভোটে চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হন। শ্রীসেনগুপ্তই আগরতলা পুরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ডাঃ মেজর দত্ত ১৪—২ ভোটে হন ভাইস চেয়ারম্যান। নির্বাচন হয় ২৮শে নভেম্বর। চীফ কমিশনারের উপদেষ্টা পদে মনোনীত হওয়ার পর সুখময়-বাবু ১৯৫৩ ইং সনের এপ্রিল মাসে চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন এবং নৃপেন্দ্রকুমার চন্দ পরবর্ত্তী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

অর্থাভাবে এই পুরসভার বিভিন্ন কাজকর্ম ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। সরকারও তেমন সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেননি। ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মহলে। কিছু না করতে পারার অভিযোগে করদাতা সমিতির অন্যতম কমিশনার শ্রীদ্বিজেন দে প্রথম পদত্যাগ করেন—১৯৫৪ ইং সনের শেষ ভাগে। আর সম্পূর্ণ পুরসভাই অর্থাৎ অবশিষ্ট সমস্ত কমিশনারই (দলমত নির্বিশেষে) পদত্যাগ করেন ১৯৫৫ ইং সনের ২৪শে এপ্রিল—রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চরম উপেক্ষা ও অসহযোগিতার অভিযোগ এনে।

সরকার আগরতলা পুরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাজকর্ম পরি-চালিত হতে থাকে প্রশাসকের মাধ্যমে। নির্বাচনের দাবী উঠতে থাকে সর্বস্তর থেকে—বারে বারে। কিন্তু সরকারের কাছে তা কোন পাত্তা পায় না। রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার। শচীন্দ্রলাল সিংহ ও সুখময় সেনগুপ্তের রাজত্ব। এইভাবে কাটে প্রায় ২৩ বছর—বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্য্যন্ত।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় (১৯৭৮ ইং) এসে পুর-আইনের কিছু সংশোধন করেন। ৬টি ওয়ার্ডের স্থলে ১০টি ওয়ার্ড এবং ১৮ জন কমিশনারের স্থলে ১০ জন কমিশনার নির্দিষ্ট হয়। নির্বাচন হয় ২৫শে জুন, ১৯৭৮ ইং। দশটি আসনেই বাম-প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্পূর্ণ হেরে যায়। চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন অমল দাশগুপ্ত, আর মণিময় দেববর্মা হন ভাইস চেয়ারম্যান।

আবার পুর-আইনের কিছু সংশোধন করে ১৩টি ওয়ার্ডে ১৩ জন কমিশনারের বিধান রেখে ১৯৮৩ ইং সনের ৩রা জুলাই আগরতলা পুরসভার নির্বাচন হয় এবং তাতেও বামফ্রন্টের প্রার্থীরাই জয়লাভ করেন। এবারও চেয়ারম্যান অমল দাশগুপ্ত। ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন চিত্ত চন্দ।

১৯৮৮ ইং সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস-টি ইউ জে এস জোট সরকার এই পুরসভা ভেঙ্গে দেন। তদবধি আবার প্রশাসকের পরিচালনায় চলে যায় আগরতলা পুরসভা।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা রাজ্যের মহকুমা সহরগুলোতেও ছড়িয়ে দেন, নোটিফায়েড্ এরিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে। মহকুমা-সহর ছাড়াও, কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া, রাণীরবাজার প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতেও এখন নোটিফায়েড্ এরিয়া অথারিটি রয়েছে।

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া, আর একটি মিউনিসিপ্যালিটিও রাজ আমলে বহাল ছিল। তার নাম—পুরাতন আগরতলা মিউনিসি-প্যালিটি অর্থাৎ পুরাতন আগরতলায়ও পৌরসংস্থা ছিল। তার উল্লেখ পাওয়া যায় "রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা"র ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৩৯ নং মেমোতে। ঐ মেমোর শিরোনাম হচ্ছে—"নূতন ও পুরাতন আগরতলা পৌরসংস্থার চেয়ারম্যান নিয়োগ"। ঐ মেমোর আদেশে তৎকালীন পলিটিকেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে 'নূতন হাবেলী ও আগরতলা মোকামের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান' নিযুক্ত করা হয়। তারিখ—১৩০৭ ত্রিপুরাব্দ (১৮৯৭ খৃঃ) ১১ই বৈশাখ। এছাড়া অবশ্য, পুরাতন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির আর কোন উল্লেখ কোথায়ও পাইনি।

সহরের পূর্বদিকের খয়েরপুরও ছিল তখন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভূক্ত। ঐ পুস্তকের ৪৭৬ পৃষ্ঠার একটি 'নোটিশ'-এ তার উল্লেখ রয়েছে। নোটিশটি নিম্নরূপ ঃ—

"আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খএরপুর মহাল্লানিবাসী শ্রীপহরচান্দ দারোগা—সমীপে

"ইহার পার্শ্বে যে বিল দেওয়া গেল, তদনুসারে তোমার মং ৬ টাকা দেনা আছে। এইক্ষণ তোমার নিকট সেই টাকার দাওয়া হইতেছে, এই টাকা মিউনিসিপ্যাল অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে না দিলে তোমার দ্রব্য ক্রোক ও নীলামকরণ দ্বারা....... খরচ সহিত ঐ টাকা তোমার নিকট হইতে আদায় করা যাইবে, ইতি।.. "

উল্লেখ্য, পহরচান্দ দারোগার কাছে পাওনা উক্ত মং ৬ টাকা মোট চার বছরের ট্যাক্স—১৩০৩ ত্রিপুরাব্দ থেকে।

বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়ার অনুকরণে বিভাগীয় সহর সমূহে "নগর সমিতি" গঠনক্রমে জনগণকে মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চিন্তাভাবনা মহারাজ বীরবিক্রমেরও ছিল। ১৩৪৮ ত্রিং সনের (১৯৩৮ ইং) ১৬ই আশ্বিন এই মর্মে তিনি এক নির্দেশও জারী করেছিলেন। ঐ নির্দ্দেশে ছিল—বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, পদাধিকার বলে হবেন ঐ সমিতির সভাপতি বা চেয়ারম্যান; দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য হবেন নির্ব্বাচিত এবং বাকীরা মনোনীত। তবে, ঐ নির্দ্দেশমত সমিতি গঠিত হয়েছিল কিনা, তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

* * *

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম স্কুল—

"নূতন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়"। বেসরকারী স্কুল। প্রথমে পাঠশালা। প্রতিষ্ঠাকালের কোন হদিশ পাইনি; অনুমান, মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের সরকারী কাগজপত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। (সূত্র—উমাকান্ত একাডেমীর 'শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ')।

প্রথম সরকারী স্কুল—

"নূতন হাবেলী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয়"। ইহা উপরোক্ত স্কুলেরই উন্নত সংস্করণ। স্কুলটি পাঠশালা থেকে নিম্ন বাংলায় এবং তৎপরে উচ্চ বাংলায় উন্নীত হয়। অতঃপর ইংরেজী পাঠের ব্যবস্থা করে নামকরণ করা হয় ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয়। বাংলা এবং ইংরেজীর আলাদা আলাদা বিভাগ এবং আলাদা আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র স্কুলটি অধিগ্রহণ করেন। (সূত্র—ঐ।)

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের বা তার আগের সরকারী কাগজপত্রে নিম্নের স্কুল-গুলোরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়:—ফটিগুলি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় (ধর্মনগর), কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল, মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, সোনামুড়া মধ্য ইং বিদ্যালয় ও বিলনীয়া মধ্য ইং বিদ্যালয়। তাছাড়াও উল্লেখ আছে—যাত্রাপুর, গোলধারপুর, ঋষ্যমুখ, খোয়াই, পুরাতন হাবেলী, কুলুবাড়ী প্রভৃতি পাঠশালা বা প্রাইমারী স্কুলের। সবগুলো স্কুলই ছিল তখন বেসরকারী বা প্রাইভেট। রাজ-সরকার থেকে কোন কোন স্কুল কিছু কিছু সাহায্য পেত। (সূত্র—ঐ)

শিক্ষার অগ্রগতির বা বিদ্যালয় বিস্তৃতির বিষয়টি সমর্থিত হয় রাজগী ত্রিপুরার ১২৮৭ ত্রিং (১৮৭৭ খৃঃ), ১৫ই শ্রাবণ তারিখে জারী করা 'শিক্ষা অধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী'র প্রথম প্যারা থেকে,—যেখানে বর্ণিত হয়েছে—

"প্রকাশ যে ডাইরেকটারী অফিস ক্রমশই নূতন নূতন স্কুল সংস্থাপনের সহিত কার্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সুতরাং ·········।" (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—পৃঃ ৩২৯)।

ত্রিপুরা রাজ্যে মেয়েদের প্রথম স্কুল—

"মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়"। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি পাঠশালা। এর প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। বর্ত্তমান স্কুল-বিল্ডিং-এর সামনে লেখা রয়েছে—প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৬ শকাব্দ তথা ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ তথা ১৩০৪ ত্রিপুরাব্দ। অথচ একাডেমীর শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দেই অর্থাৎ আরও ষোল বছর আগেই স্কুলটির উল্লেখ রয়েছে। তারাও রাজগী ত্রিপুরার উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় বন্ধু এবং গবেষক রমাপ্রসাদ দত্তের মতে, স্কুলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ-অন্তঃপুরে। অতঃপর উঠে আসে বর্ত্তমান উমামহেশ্বরী কালীবাড়ীর জায়গায় একটি আটচালা ঘরে। নিম্নবাংলায় উন্নীত হয়ে চলে আসে বর্ত্তমান স্থানে—১৮৯৪ খৃঃ অব্দে। আমারও ধারণা তাই

মেয়েদের প্রথম সরকারী স্কুল—

"মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়"। নিম্নবাংলা থেকে উচ্চ বাংলা এবং ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন, শিক্ষা বিভাগ)।

এখানে উল্লেখ্য, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যই প্রথম রাজ্যবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব সরকারীভাবে গ্রহণ করেন। তার আগে সব স্কুলই ছিল বেসরকারী বা প্রাইভেট। কিছুকাল পরে এক রাজ-আদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইভেট বা বেসরকারী স্কুল গঠন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাজ-শাসনের শেষে, রিজেন্সী আমলে, ১৯৪৭ ইং সনে আবার প্রাইভেট স্কুল স্থাপনের অনুমতি মিলে।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম হাইস্কুল—

"আগরতলা সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়"। সম্পূর্ণ সরকারী। প্রতিষ্ঠাকাল— ১৫/১২/১৮৯০ ইং। নূতন হাবেলী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভবনেই এর কাজ আরম্ভ হয়। হাই স্কুলে উন্নয়নের আগে স্কুলটির নাম ছিল—'মহারাজোলী নতুন হাবেলী ইংরেজী বিদ্যালয়' (সূত্র—কুমিল্লার স্কুল ইনস্পেকটার দীননাথ সেনের ২৮/৮/১৮৯০ ইং

তারিখের ভিজিটিং রিপোর্ট—শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ)। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ খৃঃ অব্দ থেকে এর নাম হয় 'উমাকান্ত একাডেমী'।

মেয়েদের প্রথম হাইস্কুল—

"মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়"। সম্পূর্ণ সরকারী। মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টিই হাইস্কুলে উন্নীত হয়। সময়—অনুমান ১৯৪০-৪১ ইং। অনেক চেষ্টা করেও সঠিক সময় পাইনি।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বেসরকারী হাইস্কুল—

"নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন", আগরতলা। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৪৮ খৃঃ অব্দ। পূর্ব্ব বঙ্গাগত উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ের চাপে এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দের নিরলস চেষ্টায় রিজেন্ট মাতামহারাণী কাঞ্চনপ্রভাদেবী বেসরকারীভাবে স্কুলটি স্থাপনের অনুমতি দেন। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই স্কুলটিই প্রথম বেসরকারী স্কুল!

মেয়েদের প্রথম বেসরকারী হাইস্কুল—

'বাণীবিদ্যাপীঠ", রামনগর, আগরতলা। প্রতিষ্ঠাকাল—১৩৫৫ বাংলা অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃঃ অব্দ। ঐ একই চাপে এবং আদেশ মূলে প্রতিষ্ঠিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম কলেজ—

"আগরতলা কলেজ"। সম্পূর্ণ সরকারী। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯০০ খৃঃ অব্দ। আগরতলা সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গৃহেই এর কাজ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ অধ্যাপনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন ঐ বিদ্যালয়েরই শিক্ষক-বৃন্দ। কারণ, একজন অধ্যাপকের স্থলে আর একজন অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছাড়া, আর কোন অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ নিয়োগের কোন উল্লেখ নেই গোড়ার দিকে। চার বছর পরে, ১৯০৪ খৃঃ অব্দের মেমো নং—৪ থেকে একজন অধ্যক্ষ নিযুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐ মেমোতে আছে—"শ্রীযুক্তবাবু কুঞ্জলাল নাগ এম এ আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যালপদে নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যে উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে মাসিক মং ৩৫০ টাকা তিনশত পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন পাইবেন।" নীচে স্বাক্ষর মন্ত্রী

উমাকান্ত দাসের। কলেজটি ছিল F. A. কলেজ। প্রথম সেসনে তিনজন (১৯০২ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় সেসনে (১৯০৩ খৃঃ) দুইজন এখান থেকে F. A. পাশ করে। ১৯০৪ বা ১৯০৫ এর কোন উল্লেখ কোথাও নেই। অতঃপর কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ায়। (সূত্র—শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ও রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা)।

অনুমোদিত প্রথম (আসলে দ্বিতীয়) কলেজ—

"মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ", আগরতলা। সম্পূর্ণ সরকারি। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৪৭ খৃঃ অব্দ। প্রথম অধ্যক্ষ—এ কে মুখার্জ্জী। কিছুকাল পরে যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী।

ত্রিপুরায় প্রথম বেসরকারী কলেজ—

"রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয", কৈলাসহর। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৫০ খৃঃ অব্দ। প্রথম অধ্যক্ষ—ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

প্রথম নৈশ কলেজ—

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের সান্ধ্য বিভাগ। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৫৪ খৃঃ অব্দ। আই এ (কম) ও বি এ (কমং) খোলা হয়। তবে বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

অনুমোদিত প্রথম নৈশ কলেজ—

"বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজ", আগরতলা। সম্পূর্ণ সরকারী। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৬৯ খৃঃ অব্দ। প্রথম অধ্যক্ষ—শান্তিব্রত গুপ্ত।

ত্রিপুরায় মেয়েদের প্রথম কলেজ—

"মহিলা কলেজ", আগরতলা। সম্পূর্ণ সরকারী। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৬৩ খৃঃ অব্দ। প্রথমে এম বি বি কলেজেই এর ক্লাশ আরম্ভ হয়। এক বছর সেখানেই চলে। ১৯৬৪তে উঠে আসে বর্ত্তমান বাড়ীতে। প্রথম অধ্যক্ষ—সুশান্ত কুমার চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)। শ্রীচৌধুরী তখন এম বি বি কলেজের অধ্যক্ষ। সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ ইং থেকে অধ্যক্ষ—ডঃ হীরালাল চাটার্জ্জী।

প্রথম বেসিক ট্রেনিং কলেজ—'বেসিক ট্রেনিং কলেজ', আগরতলা। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৫৪ খৃঃ অব্দ।

ত্রিপুরায় ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ—'ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ', বড়জলা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৫—৬৬ খৃষ্টাব্দ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ—প্রতিষ্ঠাকাল— ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ। **প্রথম** সভাপতি—অনিল কুমার দাশগুপ্ত। প্রথম সচিব—শেখরচাঁদ জৈন।

ত্রিপুরায় বিশ্ববিত্তালয়—

মহারাজ বীরবিক্রমের ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের 'বিত্তাপত্তন' পরিকল্পনা ত্রিপুরায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যেই রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাজের অকাল মৃত্যু এবং রাষ্ট্রিয় বা শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তনের ফলে তা আর সম্ভব হয়নি। অতঃপর বর্ত্তমান ব্যবস্থায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নাম— "ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়"। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ। প্রথম আচার্য্য—জেঃ কে ভি কৃষ্ণরাও (অবসরপ্রাপ্ত)। **প্রথম** উপাচার্য্য— ডঃ জলদ বরণ গাঙ্গুলী।

ত্রিপুরায় সংস্কৃত বিত্তালয়—

মহারাজদের আমলে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয়ের নাম ছিল—'আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয়'। ১৩১৩ ত্রিং সনে (১৯০৩ খৃঃ) এর নিয়মাবলী রচিত হয়। (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা)। বর্ত্তমানে 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যক্ষ—ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশ।

আবার গোড়ায় ফিরে যাই। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম স্কুল নূতন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়, হাই স্কুল বা কলেজের জন্য তার অস্তিত্ব হারায়নি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় "নূতন হাবেলী মধ্য ইংরেজী স্কুল" পরিচয়ে। সরে যায় তখন কৃষ্ণনগরে। আমার মনে হয়, এই স্কুলটিই পরে "বিজয়কুমার এম-ই স্কুল" নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—মন্ত্রী বা দেওয়ান বিজয়কুমার সেনের সম্মানে।

চিকিৎসা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, আগরতলা সহরে—মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় (সূত্র—"শতাব্দির ত্রিপুরা"—রমাপ্রসাদ দত্ত)। নাম—"নূতন হাবেলী দাতব্য চিকিৎসালয়"। ডাক্তার—রাজমোহন বসু। (সূত্র—"ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন"—শিক্ষা বিভাগ)।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিপুরার প্রথম হাসপাতাল—"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হাসপাতাল"—সংক্ষেপে যার নাম ভি এম হসপিটেল, আগরতলা সহরে, বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে বা সম্মানে। কিছুকাল পরে ডাঃ মণিময় মজুমদার এর ভারপ্রাপ্ত হন—চীফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে। লেডী ডাক্তার হিসেবে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই নিযোজিত ছিলেন মিস এইড —মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে। (সূত্র রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা")।

উক্ত ভি এম হাসপাতাল সংলগ্নে একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের উদ্যোগে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের নামে স্কুলটির নামকরণ করা হয়—"এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন"। (সূত্র—ঐ ঐ)।

শেয়াল-কুকুর দংশনের প্রতিষেধক বিভাগ প্রথম খোলা হয় ভি এম হাসপাতালে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। তার আগে এ জন্য ঢাকা, শিলং বা কলকাতায় যেতে হত।

প্রসূতি সদনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয় আগরতলা ভি এম হাসপাতালে ২৬/১/৫২ ইং তারিখে। শিলান্যাস করেন চীফ কমিশনার নানজাপ্পার স্ত্রী ললিতা নানজাপ্পা।

কফ-রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয় ত্রিপুরায় সম্ভবতঃ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে—আগরতলার ভি এম হাসপাতালে। পরীক্ষা করতেন ডাঃ শশধর ভট্টাচার্য্য (বর্তমান ডাঃ সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পিতৃদেব)।

ক্রমে ক্রমে শিশু-ওয়ার্ড, আইসোলেশন ওয়ার্ড, এক্স-রে'র ব্যবস্থাদি সংযোজিত হয়ে ভি এম হাসপাতাল একটি উন্নত ধরণের হাসপাতালে পরিণত

হয়। জি বি হাসপাতালের গোড়াপত্তনের আগে এই ভি এম হাসপাতালই ছিল ত্রিপুরার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বসুবিধাযুক্ত হাসপাতাল। এই হাসপাতালটির বর্ত্তমান নাম "ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়েল হাসপাতাল"— প্রযাতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে।

১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও এ রাজ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল সীমিত। প্রাইভেট এলোপ্যাথী চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছিলেন না কোন প্রাইভেট এম-বি বা এল এম এফ ডাক্তার। ভি এম তথা সরকারী ডাক্তাররাই ছিলেন এলোপ্যাথী চিকিৎসার একমাত্র ভরসা। তাঁরা ভিজিটে প্রাইভেট রোগী দেখতেন। ভি এম-এর দু-একজন কম্পাউণ্ডারও ছিলেন এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। তাঁরাও ভিজিটে প্রাইভেট কলে যেতেন।

তবে হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসার সরকারী ও প্রাইভেট—দুই ব্যবস্থাই ছিল। সরকারী কবিরাজ বা রাজবৈদ্য ছিলেন শেষটায় সুরেন্দ্র কবিরাজ আর প্রাইভেট ছিলেন তখন চন্দ্রোদয় কবিরাজ, প্রভাত কবিরাজ, সুখলাল কবিরাজ সহ আরও কয়েকজন। হোমিওপ্যাথীতে প্রাইভেট ডাক্তার ছিলেন তখন দুর্গামোহন দত্ত, অসিত দেববর্মা, মৃত্যুঞ্জয় নন্দী, ননীগোপাল দত্ত (শিক্ষক), প্রফুল্ল রক্ষিত প্রমুখ আরও দু-তিনজন। আর ষ্টেট হোমিও-প্যাথ ছিলেন ডাঃ কুমুদবন্ধু ঘোষ ডাক্তার বা চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন ছিল সীমিত, লোকসংখ্যাও তখন এই আগরতলা সহরের ছিল মাত্র হাজার পাঁচ-এর মত।

১৯৪৬ ইং সনের অক্টোবরের নোয়াখালী দাঙ্গা এবং পরবর্তী দেশভাগ জনিত কারণে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এ রাজ্যের লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় ডাক্তার-কবিরাজের সংখ্যাও। অনেক ডাক্তার-কবিরাজও উদ্বাস্তু হয়ে আসেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া তথা কুমিল্লা জেলার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী, এম-বি চলে আসেন এরাজ্যে এবং তিনিই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম প্রাইভেট এম-বি ডাক্তার। কিছুকাল পরেই আসেন ডাঃ রাখালচন্দ্র ঘোষ এম-বি; তারও কিছুকাল পরে ডাঃ যতীশ চক্রবর্তী এম-বি এবং তাঁরা উভয়েই প্রাইভেট ডাক্তার। আসেন কয়েকজন এল এম এফ-ও।

রাজ্যের বৃহত্তম এবং সর্ব্বসুবিধাযুক্ত হাসপাতাল জি বি'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬১ ইং। উদ্বোধন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না। হাসপাতালটি নামাঙ্কিত হয় তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নামে। এর নির্ম্মাণে ব্যয় হয় ৩৯ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনকালে এর শয্যাসংখ্যা ছিল ৩১৬টি।

* * *

রাজ আমলের যাতায়াত ও পরিবহন

পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরভাগে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এমন কি, এই শতকের তৃতীয় দশকেও। একমাত্র পায়ে-হাঁটা পথই ছিল সম্বল,—তাও খুব অভ্যন্তর ভাগে নয়। আর সম্বল ছিল জলপথ,—পায়ে হেঁটে বা নৌকায়। মহারাজারা বা পদস্থ রাজকর্মচারীরা যাতায়াত করতেন, হয় হাতীর পিঠে চড়ে, নয়তো নৌকায়। হাতীর সাহায্যে কোথাও যেতে হলে, এক মাস না হলেও, অন্ততঃ এক পক্ষকাল আগে তার প্রস্তুতি নিতে হত—দু'ধারের জঙ্গল পরিষ্কার এবং হাতী চলাচলের উপযোগী করে রাস্তা মেরামতের জন্য।

বিভাগীয় সহর সমূহে যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল বৃটিশ ভারতের উপর দিয়ে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সাহায্যে। আখাউরায় রেলে চড়ে নির্দিষ্ট বিভাগীয় সহরের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ষ্টেশনে নেমে, তারপর পায়ে হেঁটে, নদীপথে বা হাতীতে সেই সহরে পৌঁছা। এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল স্বাধীনতার বা ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পরেও, অন্ততঃ উত্তরের বিভাগসমূহে এবং দক্ষিণের সাব্রুমে। বিলনীয়া, সোনামুড়া ও উদয়পুর যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল। কুমিল্লা ষ্টেশনে নেমে মোটরযোগে বিবিরবাজার পৌঁছে তারপর পায়ে হেঁটে সোনামুড়া, আর নদীপথে উদয়পুর। শেষটায় উদয়পুরেও মোটরে বা

বাসে যাওয়া যেত—কুমিল্লার 'পল এণ্ড পিলের' মোটর সার্ভিসের সাহায্যে। ফেণী-বিলনীয়া রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর, বিলনীয়া যাতাযাত হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুগম। তার আগে ফেণী থেকে গরুর গাড়ীতে বা পায়ে হেঁটে বা হাতীর পিঠে চড়ে বিলনীয়া পৌঁছতে হত,—রাস্তা প্রায় ১৬ মাইল।

এই শতকের চতুর্থ দশকেও আভ্যন্তরীণ রাস্তা ছিল মাত্র আগরতলা—রাণীরবাজার, আগরতলা—পুরাতন আগরতলা, আগরতলা—হাতীলেঠা (বর্ত্তমান সূর্য্যমণিনগর) এবং আগরতলা—আখাউরা পর্য্যন্ত। রাস্তাগুলো তখন মোটরযান চলাচলের উপযোগী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরী হয় চট্টগ্রাম—আগরতলা মিলিটারী রোড ভায়া কুমিল্লা। ফলে অভ্যন্তর ভাগে উদয়পুর, সোনামুড়া ও বিশালগড় যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যায় ত্রিপুরার চূড়ান্ত ভারতভুক্তির পর তৈরী হয় আগরতলা—আসাম রোড, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে ও উদ্যোগে। রাস্তাটির কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৯-৫০ ইং সনে। সিঙ্গারবিল বিমান ঘাঁটির কল্যাণে তথা যুদ্ধের কল্যাণে তৈরী হয় আগরতলা—এয়ারপোর্ট রোড—১৯৪০ ইং সনে।

এই শতকের গোড়ার দিকে উপরোক্ত ছোট ছোট রাস্তাগুলোতে গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করত। মোটরযান চলাচলের প্রথম উল্লেখ পাই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এক আদেশে। ঐ আদেশে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মোটরগাড়ীর লাইসেন্সের কথা বলা আছে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)। অবশ্য মহারাজদের এবং উচ্চ পদস্থ কর্ত্তা-ব্যক্তিদের প্রাইভেট কার তার আগেও ছিল।

ত্রিপুরার প্রথম মোটর পরিবহন সংস্থা আগরতলা—আখাউরা যাতয়াত করত,—রাস্তা ৬ মাইল। এখানকার মোটরষ্ট্যাণ্ড ছিল বর্ত্তমান মিউনিসি-প্যালিটি অফিসের পূর্ব্বদিকের বটতলায়। ভাড়া ছিল মনে হয় প্রথমে ছ'আনা অর্থাৎ বর্ত্তমানের ১২ পয়সা। কোম্পানীর নাম আগে কি ছিল জানি না। তবে ১৯৩৮ ইং সনে "দি আগরতলা মোটর ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানী"র নাম পাওয়া যায়। অতঃপর আসে "সি এম টি সি" আগরতলা—আখাউরা রাস্তায়। তখন মোটরষ্ট্যাণ্ড বর্ত্তমান মোটরষ্ট্যাণ্ডে—পেট্রল পাম্পের উত্তর-পূর্ব কোণে। তারও পরে আসে "এন এম টি এস"—দেশভাগের পরে, ঐ

একই রাস্তায় এবং একই ষ্ট্যাণ্ডে।

এই সব সংস্থার পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে মালীক ছিলেন রাজবাড়ীর কর্ত্তা-ব্যক্তিগণ—মহারাজকুমার, রাজকুমার, কুমার প্রমুখরা। সি এম টি সি এবং এন এম টি এস-এ কণ্ট্রাকটার আব্দুল বারিক খানও (গেদু মিঞা) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এম বি বি কলেজ খোলার প্রাক্কালে ১৯৪৬ ইং সনে "কলেজ ট্রেন্সপোর্ট"—এর প্রয়োজনে গঠিত হয় "দি ত্রিপুরা অটোমোবাইল সিণ্ডিকেট"।

মহারাজ বীরবিক্রম রাজ্যভার গ্রহণ করেই আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্টিন এণ্ড কোং-এর সাহায্যে কমলাসাগব থেকে উদয়পুর এবং কমলাসাগর থেকে বীরেন্দ্রনগর পথে (জীরাণীযা) দুটি লাইট রেলওয়ে স্থাপনে তিনি সচেষ্ট হন—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। তন্মূলে জরীপ কার্য্যও হয়েছিল (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)। কিন্তু কেন তা হলো না, তার আর কোন উল্লেখ নেই।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর উদয়পুর সফরে যাবেন। সময়—১৩২৩ ত্রিং সনের ১৩ই কাত্তিক (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ)। প্রথমে প্রাইভেট কারে আখাউরা, আখাউরা—কুমিল্লা ট্রেনে, কুমিল্লা—বিবিরবাজার মোটরে, অতঃপর নৌকা যোগে উদয়পুর। এ থেকেই আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের দুরূহতা উপলব্ধি করা যায় (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)।

মাল পরিবহনও ছিল দুরূহ ও ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। আগরতলার মাল আসত আখাউরা থেকে মোটরে বা নৌকায় পাশের খাল দিয়ে অথবা মোগড়া থেকে নৌকায় হাওড়া নদী হয়ে। তখন হাওড়া নদী নাব্য ছিল জীরাণীয়া-চম্পকনগর পর্য্যন্ত। সুতরাং ঐসব জায়গার মালও এই নদী-পথেই বাহিত হত। বিশালগড় গোলাঘাটির মাল আসত সালদা হয়ে বিজয় নদী দিয়ে —নৌকা যোগে।

অন্যান্য বিভাগ সমূহের (বর্ত্তমানে মহকুমা) মালপত্র বাহিত হত বৃটিশ ভারতের সংশ্লিষ্ট রেলষ্টেশন থেকে গরুর গাড়ীতে বা নৌকায়। কোথাও কোথাও ঘোড়ারও ব্যবস্থা ছিল। চা-বাগান সংশ্লিষ্ট এলাকার কোথাও কোথাও ট্রলিও মাল পরিবহন করত। তবে মুখ্য ব্যবস্থা ছিল নৌকা-ই।

সবগুলো নদীই ছিল তখন নাব্য,—কোন কোনটি উৎসমুখ পর্য্যন্তও। উদয়পুর, অমরপুর এবং সাব্রুমের একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা ছিল নৌকায়—গোমতী ও ফেণী নদীর জলপথে। স্বাধীনতার পরে পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নদীসমূহের নাব্যতাও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

* * *

রাজন্য ত্রিপুরায় ব্যাঙ্ক

বর্ত্তমান শতকের তৃতীয় দশকে (১৯২১-৩০) বৃটিশ ভারতে, বিশেষ করে রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লায় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রবল জোয়ার বয়ে যায়। প্রায় প্রতিদিনই, হয় ব্যাঙ্ক নয় বীমা কোম্পানী গঠনের সংবাদ পাওয়া যেত কুমিল্লা জেলা থেকে। কুমিল্লাকে তখন ব্যাঙ্কের পীঠস্থান বলা হত।

পার্শ্ববর্তী জেলার এই প্রবল জোয়ার আছরে পড়ে ত্রিপুরা রাজ্যেও। গড়ে উঠে এখানেও ব্যাঙ্ক,—ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক। একটা অন্তরায় ছিল এবং তা হল ত্রিপুরা রাজ্যে তখন ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী গঠনের আইন ছিলনা। তাই উদ্যোক্তাদের দৌড়াতে হত বৃটিশ ভারতের কলকাতায় এবং বৃটিশ ভারতের আইনানুযায়ীই ব্যাঙ্ক গঠন করতে হত। তাই, একমাত্র ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক বাদে, বাকী সব ব্যাঙ্কেরই রেজিষ্টার্ড অফিস ছিল, হয় গঙ্গাসাগরে (মোগরা), নয় আখাউরায়—অর্থাৎ বৃটিশ ভারতে।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম ব্যাঙ্ক—"দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্"। মহারাজ বীরবিক্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হরিদাস ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ ইং সনের ৯ই এপ্রিল। এটি যেমন ত্রিপুরার প্রথম ব্যাঙ্ক, তেমনি এটিই ছিল বহুল-প্রচারিত ও বহুল-প্রসারিত। ত্রিপুরার সর্বত্রতো এর শাখা অফিস ছিলই, ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও, বৃটিশ ভারতের সিলেট, চাঁদপুর, বদরপুর, আশুগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও এর শাখা অফিস ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই ব্যাঙ্কই ত্রিপুরা রাজ্যের

একমাত্র সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। কামান চৌমুহনীর পাশে এই ব্যাঙ্কের বিল্ডিং-এ এখন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাখন সাহার বাড়ী ও সরলা ষ্টোর্স (সূত্র—ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার্স)।

রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক—"দি গিরীশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।" উকীল গিরীশ চক্রবর্তীর নামে তাঁর বড় ছেলে জিতেন্দ্র চক্রবর্তী ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩০ ইং সনের ১লা এপ্রিল। মোটরষ্ট্যাণ্ড রোডের পশ্চিম মাথায় উত্তর দিকের বিল্ডিং-এ ছিল এর অফিস। এর কোন শাখা সম্ভবতঃ ছিলনা। (সূত্র-ঐ)

মহারাজ বীরবিক্রমের উদ্যোগে রাজ-সরকারের তরফে ১৯৩১ ইং সনে আগরতলা ট্রেজারীতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। এতে স্থায়ী আমানত সহ সকল প্রকার আমানতের ব্যবস্থা ছিল এবং রাজ-কর্মচারীদের এ থেকে কর্জ দেওয়া হত। (সূত্র—ঐ)।

পরের ব্যাঙ্কটি—"দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড"। মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ ইং সনে। এর অল্প কয়টি শাখা অফিস ছিল। বর্তমান সরলা ষ্টোর্সের সোজা উত্তর দিকের গম্বুজ-ওয়ালা বিল্ডিং-এ এর অফিস ছিল। (সূত্র—ঐ)

১৯৩৫ ইং সনের ভাদ্র মাসে রাজ-সরকারের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় "ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক"—রাজ্যের ও বাইরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে। বার্ষিক সুদে এতে আমানত নেওয়া হত এবং কর্জ দেওয়া হত কর্মচারীদের। মূল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর দক্ষিণের বারান্দায় একেবারে পশ্চিম দিকের ঘরে (বর্তমানের পলিটিকেল বিভাগের সংলগ্ন পশ্চিমে) এর অফিস ছিল। (সূত্র—ঐ)।

অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হয় "দি রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ" মহারাজকুমার দুর্জয়-কিশোর দেববর্মণ ও কন্ট্রাকটার আব্দুল বারিক খানের (গেছু মিঞা) উদ্যোগে ও নেতৃত্বে—সম্ভবতঃ ১৯৪৪ ইং সনে। এর কোন শাখা অফিস ছিল না। সেন্ট্রেল রোডে বর্তমান জনশিক্ষা প্রেসের বিল্ডিং-এ এর অফিস ছিল। ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার্সে এর কোন উল্লেখ নেই।

ত্রিপুরা রাজ্যের আইনে 'দি ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে—মহারাজ বীরবিক্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎকালীন অর্থ-মন্ত্রী রায় সাহেব সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে। সারা ত্রিপুরায় এবং কলকাতায় এর শাখা অফিস ছিল। বর্তমান কংগ্রেস অফিস বিল্ডিংটিই ছিল এর নিজস্ব অফিস-বিল্ডিং।

স্বভাবতঃই জোয়ারের পর ভাটা থাকে। জোয়ারের যেমন জোর, ভাটারও তেমন জোর। রমরমা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও ভাটা আরম্ভ হয় পাঁচের দশকের শেষ ভাগে এবং খুব জোর ভাটা। ১৯৩৮-৫১ সময় কালে সারা ভারতে ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীগুলো প্রতিযোগিতা করে ফেল পড়তে লাগল। তার ঢেউ এসে লাগল ত্রিপুরায়ও। ১৯৪৯-৫৫ মধ্যে ত্রিপুরার ব্যাঙ্কগুলোও সব ফেল পড়ে গেল। প্রথম ফেল পড়ল গিরীশ ব্যাঙ্ক, আর সবশেষে ফেল পড়ল ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লিঃ।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাইরে থেকে আসা প্রথম ব্যাঙ্ক—"দি ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড্"। মহারাজকুমার হেমন্তকিশোর দেববর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাঙ্কটি ১৯৪৬ ইং সনে আগরতলায় শাখা খুলে।

রাজ্যের বাইরে থেকে আসা ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে এখনও চালু এবং প্রথম ব্যাঙ্ক—"দি ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ।" ১৯৪৯ ইং সনের অক্টোবর মাসে এই ব্যাঙ্কটি আগরতলায় শাখা স্থাপন করে।

বাইরে থেকে আসা এবং এখনও চালু দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক—"দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ।" ১৯৫২ ইং সনে ব্যাঙ্কটি আগরতলায় প্রথম শাখা খুলে।

* * *

রাজ আমলে সিনেমা

মহারাজ বীরবিক্রমের রাজত্বকালের আগে ত্রিপুরায় কোন সিনেমার তথা ছায়াছবি প্রদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বীরবিক্রমের আমলে প্রথম যে সিনেমা হলের নাম পাওয়া যায় তা হচ্ছে "মীরা টকিজ"। এগার সহযোগী সম্মিলিতভাবে এই হলটি স্থাপন করেন মেলারমাঠের পূর্ব্বাংশে—বর্ত্তমান এম এল এ হোষ্টেল তথা নজরুল ছাত্রাবাসের কাছাকাছি স্থানে, সম্ভবতঃ ১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে। হলটি ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী বা সাময়িক এবং ছন-বাঁশের ঘরে। কিছুকাল পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী যে সিনেমা হলটি চালু হয় তার নাম "ত্রিপুরা সুন্দরী টকিজ"। এর উদ্যোক্তা এবং মালীক বনমালীপুরের প্রয়াত ঠাকুর নবীনকুমার দেববর্মা। এই হলটি ছিল বর্ত্তমান কংগ্রেস অফিসের সংলগ্ন পূর্বদিকে—খোসবাগে। এটিও ছিল একটি অস্থায়ী হল ছন-বাঁশের ঘরে,—ছয় মাসের লাইসেন্সের মেয়াদে, মাসিক ২৫৲ টাকা হারে কর-প্রদানের সর্ত্তে। তবে লাইসেন্স রিন্যু করে করে হলটি কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। স্থায়িত্বকাল ১৯৩৮-৪০ খৃষ্টাব্দ। আগুনে হলটি পুড়ে গেলে আর চালু করা হয় নি।

পাশাপাশি আর একটা সিনেমা হল ছিল। নাম "ত্রিপুরা টকিজ"। এটিও ছিল অস্থায়ী এবং ছন-বাঁশের ঘরে। সম্ভবতঃ এর মালিকানায় ঠাকুর সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ছিলেন। স্বল্পকাল পরে এটিও বন্ধ হয়ে যায়। এরও লাইসেন্স ছিল ছয় মাসের এবং মাসিক ২৫৲ টাকা হারের করে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)।

ত্রিপুরার স্থায়ী সিনেমা হলটি স্থাপিত হয় যুদ্ধের বাজারে সম্ভবতঃ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে। নাম—"ছায়াবাণী"। প্রকৃতপক্ষে এটিই ত্রিপুরার প্রথম সিনেমা হল। মালিকানায় বা উদ্যোগে ছিলেন প্রয়াত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, প্রয়াত গোপাল ঠাকুর (দেববর্মা) ও হৃষীকেশ (কানু) মুখার্জী। রূপসীর উত্তর দিকে বর্ত্তমান অমূল্য মার্কেটের স্থানে বিদ্যমান ছিল এই হলটি। এটি অনেক কাল চালু ছিল।

রাজ্যের দ্বিতীয় সিনেমা হল "উদয়ন"। মহারাজকুমার দুর্জ্জয় কর্ত্তা ছিলেন এর মালিকানায়—সম্ভবতঃ আরও ২/১ জন সহ। "রূপছায়ার" জায়গাটিই ছিল উদয়নের। পরে এই উদয়নই পরিবর্তিত হয় রূপছায়ায় এবং মালিকানারও কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এর পরের সিনেমা হল "সূর্য্যঘর"।

রাজ্যের তৈরী প্রথম চলচ্চিত্র—"তথাপি"। প্রযোজনায়—"ছবি ও বাণী লিঃ"। প্রথম প্রদর্শিত হয় ১০/৩/৫০ ইং তারিখে, স্থানীয় সিনেমা হল ছায়াবাণীতে। অন্যতম প্রযোজক, রাজ আমলের অর্থমন্ত্রী রায় সাহেব সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের বড় ছেলে অমর দত্ত। অর্থের যোগানদার—"দি ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লিঃ"। অতঃপরের চলচ্চিত্র "লংতরাই" আর "রূপান্তর"—সুদীর্ঘকাল পরে—রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে।

* * *

বিমান ঘাঁটি ও বিমান সেবা

রাজ্যে প্রথম বিমান ঘাঁটিটি স্থাপিত হয় সিঙ্গারবিলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে—যুদ্ধেরই প্রয়োজনে। নির্ম্মাণ ও স্থাপনাকাল ১৯৪১—৪২ ইং। অর্থের যোগানদার ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠী এবং তত্ত্বাবধায়ক মহারাজ বীর বিক্রম তথা রাজ-সরকার। ঘাঁটিটি "সিঙ্গারবিল বিমান ঘাঁটি" নামেই সমধিক পরিচিত। সরকারী কাগজপত্রে নাম "নারায়ণপুর এরোড্রাম"। যার বর্তমান নাম—"আগরতলা এয়ারপোর্ট"।

ঘাঁটিটি বিমান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি। সামরিক বিমানই উঠা-নামা করত এবং সামরিক প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত। ১৯৪২ ইং সনের ১লা অক্টোবরের রাজ্য সরকারের এক আদেশে ঘাঁটিটি "সংরক্ষিত এলাকা" বলে ঘোষিত হয়। পরবর্তী বিমান ঘাঁটিগুলো স্থাপিত হয় বিলনীয়া, খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাশহরে।

প্রথম বিমান সেবা বা বেসামরিক বিমান সার্ভিস আরম্ভ হয় সম্ভবতঃ ১৯৪৯ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে, আগরতলা—কলকাতা রুটে। প্রথমদিকে দুইটি সার্ভিস ছিল—কলিঙ্গ এয়ার লাইন্স আর স্কাইওয়েজ-হো। ভাড়া ছিল

প্রথম দিকে ৩৫ টাকা। কোন কোন সময় ৩০/৩২ টাকায়ও যাওয়া যেত। বিমানগুলো ছিল "ডাকোটা"— ২০/২১ আসন বিশিষ্ট এবং বসার ব্যবস্থা ছিল সাধারণ বেঞ্চির মত। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাল পরিবহন। শেষটায় ভাড়া বাড়িয়ে করা হয় ৪০ টাকা।

অতঃপর আসে বিড়লার "ভারত এয়ারওয়েজ"—আগরতলা-কলকাতা রুটের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে, ১৯৪৯ ইং সনের অক্টোবর মাসে। ফলে আগের দুইটি সার্ভিস উঠে যেতে বাধ্য হয়। ভারত এয়ারওয়েজ প্রথম ভাড়া করে ৫০ টাকা। অনেক লেখালেখীর পর করে ৪৯ টাকা।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন সংগঠিত হওয়ার পর ভারত এয়ার-ওয়েজ উঠে যায় এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আগরতলা—কলকাতা রুটে সার্ভিস দিতে আরম্ভ করে। চার টাকা হ্রাস করে ভাড়া করে তারা ৪৫ টাকা ২৯/১০/৫৩ ইং তাং থেকে। অতঃপর বছরে দু'বার তিনবার করে ভাড়া বাড়াতে থাকে।

আগরতলা—কলকাতা রুটে প্রথম বিমান দুর্ঘটনা ঘটে ৩০/১২/৪৯ ইং তারিখে। বিমানটি ছিল ভারত এয়ারওয়েজের পাটবাহী স্কাই মাষ্টার। এখান থেকে প্রায় ১৭ মাইল দূরে বাংলাদেশের কসবা থানার ঈশাননগর গ্রামের সন্নিকটে বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে।

* * *

ত্রিপুরায় সংবাদ-পত্র

এই শতকের চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় প্রকৃত অর্থে কোন সংবাদ-পত্র ছিল না। পত্র-পত্রিকা অনেকই ছিল, অনেকই বেরিয়েছে ; কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের মানসিকতা তাদের ছিল না। সাহিত্য, সমালোচনা, কবিতা, রসাত্মক. ব্যঙ্গাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক রচনা এবং প্রবন্ধই থাকত এদের মধ্যে বেশী। তা ছাড়া, থাকত রাজা-মহারাজাদের স্তুতি ও বন্দনা।

'রবি'র প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, ত্রৈমাসিক রূপে—নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের যুগ্ম সম্পাদনায়। পত্রিকাটিতে সাহিত্যেরই

প্রাবল্য ছিল। (সূত্র—শতাব্দির ত্রিপুরা—রমাপ্রসাদ দত্ত)। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা'—শঙ্করীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায়। এই পত্রিকাও সংবাদ-নির্ভর নয়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনার প্রতিই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশী। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)।

প্রকৃত অর্থে ত্রিপুরার প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'নবজাগরণ'। প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৪৫ ইং। সম্পাদনায় ছিলেন পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও গোলাম নবী যুগ্মভাবে। ১৯৪৬ ইং সনে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক "অভ্যুদয়"। এতে রসরচনা বা ব্যঙ্গরচনার সঙ্গে সংবাদও থাকত। যুগ্মভাবে সম্পাদনায় ছিলেন হৃষীকেশ দেববর্মণ ও অজিত বন্ধু দেববর্মণ।

সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'—সত্যেন্দ্র কিশোর কর ও হেম চন্দ্র দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় এবং সাপ্তাহিক 'অভিযাত্রী'—প্রিয়দাস চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ ইং সনে। এই পত্রিকা দুইটির কোনটিই বেশী দিন ছিল না। অগ্রগতি অবশ্য পরে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ঠাকুর প্রভাতচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ১৯৪৮ ইং সনে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক "চিনিহা" (অর্থ—আমার দেশ)। সাপ্তাহিক "ত্রিপুরা" পুনঃ প্রকাশিত হয় এই সনে রাজেন দে'র সম্পাদনায়। 'চিনিহা' কয়েক বছর চালু ছিল। আর 'ত্রিপুরা' এখনও বহাল আছে, অবশ্য অন্য মালিকানায় ও সম্পাদনায়। '৪৮ এরই শেষ ভাগে প্রকাশিত হয় গোলাম নবীর 'ত্রিপুরা রাজ্য পত্রিকা' সাপ্তাহিক হিসেবে। কিছুকাল পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৯ ইং সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় "ইতিহাস"—শশধর বণিকের সম্পাদনায়। কয়েক সংখ্যা পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ ইং প্রকাশিত হয় অর্দ্ধ সাপ্তাহিক 'জনকল্যাণ'—জিতেন পালের (লেখকের) সম্পাদনায়। জনকল্যাণই ত্রিপুরার প্রথম অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৫৬ ইং সনে তার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৫০ ইং, ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত হয় সুখময় সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'গণরাজ' পত্রিকা—সাপ্তাহিক হিসেবে। 'অগ্রগতি' পুনঃ

প্রকাশিত হয় এই সনেরই নভেম্বর মাসে। ১৯৫১—৫৩ ইং সন মধ্যে প্রকাশিত হয় অমিয় দেবরায়ের সাপ্তাহিক 'সেবক', নিরঞ্জন ব্যানার্জীর সাপ্তাহিক 'সমাজ", কমলারঞ্জন তলাপত্রের সাপ্তাহিক 'মানুষ' এবং অনিল ভট্টাচার্য্যের সাপ্তাহিক 'সমাচার'। সিরাজুল ইসলামের সাপ্তাহিক 'ফরিয়াদ' প্রকাশিত হয় আরও কিছুকাল পরে।

১৯৪৫—১৯৫৪ ইং—এই দশকে প্রকাশিত সবগুলো পত্রিকাই প্রকৃত অর্থে সংবাদপত্র। ত্রিপুরায় সাংবাদিক জগতের সৃষ্টি হয় এই সময়কাল থেকেই। তবে, এর অনেক পত্রিকারই এখন আর অস্তিত্ব নেই। জীবিত নেই অনেক মালিক-সম্পাদক-প্রকাশকও। এর পরে, বিশেষ করে ১৯৬০ ইং এর পরে আরও অনেক পত্রিকাই আত্মপ্রকাশ করে এবং এখন অনেক পত্র-পত্রিকাই বিদ্যমান।

ত্রিপুরায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রথম ১৯৫৪ ইং সনে। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক পত্রিকার নাম 'জাগরণ'। প্রকাশনার তারিখ, ২রা অক্টোবর, ১৯৫৪ ইং। সম্পাদক—জিতেন পাল। দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকা 'গণরাজ'। প্রকাশনার কাল, এপ্রিল, ১৯৬০ ইং। সম্পাদক—সুখময় সেনগুপ্ত। তৃতীয় দৈনিক—'দৈনিক গণ অভিযান, পরিবর্ত্তিত নাম 'দৈনিক সংবাদ'। প্রকাশনার কাল—নভেম্বর, ১৯৬৬ ইং। সম্পাদক—ভূপেন দত্ত ভৌমিক। অতঃপর আরও অনেক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকটি এর মধ্যে বন্ধও হয়ে গেছে।

* * *

ত্রিপুরার পাকিস্তান-ভুক্তির ষড়যন্ত্র

মুসলীম লীগপন্থী আঞ্জুমান ইসলামিয়া জন্মলগ্ন থেকেই ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মহারাজ বীরবিক্রম ১৯৪৭ ইং সনের এপ্রিলের শেষ ভাগে ত্রিপুরার ভারত ইউনিয়নে যোগদানের ঘোষণা দেওয়ায় তারা খুব বে-কায়দায় পড়ে যায়। গুঞ্জন আরম্ভ হয় মহারাজের অধিকার নিয়ে। প্রজাদের মতামত না নিয়ে মহারাজ এরূপ

একতরফা ভাবে ঘোষণা দিতে পারেন কি? রাজ-অন্তঃপুরেও কোন কোন মহলে, বিশেষ করে মহারাজকুমার দুর্জ্জয় কর্ত্তার শিবিরে এই প্রশ্ন উঠে। এখানে উল্লেখ্য, আঞ্জুমান ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুর্জ্জয় কর্ত্তার আগা-গোড়াই মেলামেশা ও যোগসাজস ছিল।

আঞ্জুমান ইসলামিয়ার দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যায় কুমিল্লা, ঢাকা ও কলকাতায়। সাকরেদ দুর্জ্জয় কর্ত্তাও চুপচাপ বসে নেই। এই অবস্থায় হঠাৎ ঘোষিত হয় মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যু। তাঁর এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে জাতীয়তাবাদী জনগণ শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে দিশেহারা। ‘ক করে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হল? তাঁর অসুখের কোন খবরতো জনগণ জানে না?· মহারাজের মৃত্যু বিনা রোগে—বিনা চিকিৎসায়?

রাজবাড়ী থেকে প্রচার করা হল,—৭ দিনের নিমোনিয়ায় মহারাজের মৃত্যু ঘটে। জনগণ আরও বিভ্রান্ত! ৭ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ অসুস্থ—তার মেডিকেল বুলেটিন কই? দুই দিন আগেওতো মেডিকেল বুলেটিন প্রকাশ করা যেত? এত চুপচাপ কেন? ঘটনাকে চেপে যাওয়া হল কেন? জনগণ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ বললেন, এটা পাকিস্তান-পন্থীদের ষড়যন্ত্র, ওরা অষুধের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরেছে। যাই হোক, মৃত্যু মৃত্যুই। এই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক যুগ-সন্ধিক্ষণে মহারাজের অকাল আকস্মিক মৃত্যু ত্রিপুরার ভাগ্যকে চরম বিপর্য্যয়ের মুখে ঠেলে দিল।

মহারাজ কিরীটবিক্রম নাবালক। মাতামহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ‘রিজেন্ট’ হিসেবে রাজ্যের ও জমিদারীর শাসন ক্ষমতা হাতে নিলেন। বাইরের-ভেতরের অস্থিরতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তিনি ভারত সরকারের সাহায্য চাইলেন। ভারতে তখনও বৃটিশ শাসন—যদিও ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট আমাদের। সত্যব্রত মুখার্জী, আই সি এস-কে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী এবং রিজেন্টের দেওয়ান হিসেবে আগরতলায় পাঠিয়ে দিলেন ভারত সরকার।

স্বল্পকাল মধ্যেই দেওয়ান এস ভি মুখার্জী পাক-পন্থীদের খপ্পরে পড়ে যান। দুর্জ্জয় কর্ত্তা আর আঞ্জুমানীদের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যায় তাঁর দহরম-মহরম। জনগণ তা আঁচ করে বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। একদিকে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে, অপরদিকে কুমার রমেন্দ্র কিশোরের (ননী কর্ত্তা)

নেতৃত্বে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাক-পন্থীদের বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন তুমুল আন্দোলন। বিরাট প্রতিবাদ-সমাবেশের আয়োজন করা হল উমাকান্ত মাঠে. ১২ই জুলাই, ১৯৪৭ ইং তারিখে। সভাপতি ননীকর্ত্তা। শ্লোগান ও প্রস্তাব—অবিলম্বে এস ভি মুখার্জ্জীর অপসারণ চাই। উল্লেখ্য, এই প্রতিবাদ সভার উদ্যোক্তা, পাক-পন্থীরা বাদে, দলমত নির্ব্বিশেষে আর সবাই।

আরম্ভ হয় দিল্লীর দরবার। ততদিনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দিল্লীতে কংগ্রেস সরকার। উমেশবাবুরা দৌড়াদৌড়ি করে দিল্লীকে সব বুঝিয়ে বললেন। এদিকে বংশী ঠাকুর গড়লেন 'সেংক্রাক' বাহিনী—পাক-হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। আন্দোলন চলল নানাভাবে। শেষ পর্য্যন্ত দিল্লী এস ভি মুখার্জ্জীকে সরিয়ে নিলেন এবং তৎস্থলে পাঠালেন অবনীভূষণ চাটার্জ্জী, আই সি এস-কে।

বিশেষ উল্লেখ্য, পাক-পন্থীদের "টোপ" ছিল—ত্রিপুরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসন দুর্জ্জয়কর্ত্তার অনুকূলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

* * *

ত্রিপুরা উপজাতি গণ-মুক্তি পরিষদ

আমরা এর নাম জানতাম "ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ।" কিন্তু তাঁদের লেখায় সাধারণ সম্পাদক অঘোর দেববর্মা বা সভাপতি দশরথ দেব—কেউই তা স্বীকার করেননি। দশরথ দেব "ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ" আর অঘোর দেববর্ম্মা "ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ" বলে একে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের নিজ নিজ বই যথাক্রমে "মুক্তি পরিষদের ইতিকথা" এবং "ত্রিপুরায় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর"-এ।

নাম যাই হোক, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শুধুমাত্র ত্রিপুরীদের নিয়েই প্রথমে গঠিত হয় উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। দায়িত্বশীল শাসন বা স্বশাসন এবং বাঙ্গালী বিতাড়নই ছিল এর মূল ভিত্তি। বাঙ্গালীদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই ছিল এর বড় কথা বা আসল কথা।

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য—যাই হোক, তখন ত্রিপুরার কংগ্রেসীরা ছিলেন সবাই বাঙ্গালী। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় বসে। সুতরাং প্রচার হয়ে যায় বা প্রচার করা হয়—বাঙ্গালীরা রাজার রাজত্ব এবং শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

'মুক্তি পরিষদের ইতিকথায়' দশরথবাবুও লিখেছেন,—"উপজাতিদের একাংশের মধ্যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ দেখা দেয়। তারা (উপজাতিরা) মনে করেন, কংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঙ্গালীদের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজাদের হাতে রাজ্য শাসনের ভার আর ফিরে আসবে না। ··· রাজার রাজত্বের অবসানে উপজাতিরা শঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।" (পৃষ্ঠা—৩৮-৩৯)

প্রারম্ভে দায়িত্বশীল শাসনের দাবী তুলে, স্বল্পকাল মধ্যেই এর নেতৃবৃন্দ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান সম্পূর্ণ স্বশাসনের দাবীতে। গঠিত হয় পাল্টা সরকার পাহাড়ে—দশরথবাবুর নেতৃত্বে। আন্দোলন রূপ নেয় "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলনে। অঘোর দেববর্মার মতে, এই তীব্র বাঙ্গালী-বিদ্বেষের জন্য কমরেড বীরেন দত্তের বক্তৃতাই বহুলাংশে দায়ী। "আত্মগোপনকালে (১৯৪৮ ইং) উপজাতি এলাকায় বীরেন দত্তের বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বক্তৃতা। বাঙ্গালীরা শোষক আর উপজাতিরা শোষিত। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপজাতিদের মধ্যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ চাগিয় তুলে। ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে ইহাই প্রচার বা এজিটেশনের মূলভিত্তি ছিল।" (অঘোর দেববর্মার উপরোক্ত বই—পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫)।

মুক্তি পরিষদের "বাঙ্গাল-খেদা" আন্দোলন ক্রমে জঙ্গীরূপ নেয় বহু বাঙ্গালী খুন হয়, গুম হয়; অপহৃত ও লুণ্ঠিত হয় অনেকে। অনেক বাঙ্গালীর ঘর-বাড়ী-দোকান জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া হয়; জমি কেড়ে নেওয়া হয় অনেকের। শুধু বাঙ্গালীই নয়, অনেক উপজাতিও তাদের হাতে খুন-জখম হয়েছে, প্রহৃত-লাঞ্ছিত হয়েছে,—তাদের কথায় সায় না দেওয়ার জন্য, কংগ্রেস বা বাঙ্গালী-সংশ্রব না ছাড়ার অপরাধে।

পরিষদের জঙ্গীরা ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৮ ইং সদর-দক্ষিণের সিপাইজলা ঘাটে বিশালগড়ের ব্যবসায়ী তারিণী সাহাদের ৭ নৌকা বোঝাই ধান

জোর করে কেড়ে নেয়। আবার পরবর্তী ৯ই অক্টোবর তারা জোর করে কেড়ে নেয় বিশালগড়েরই ব্যবসায়ী হরি সাহার ২৩ নৌকা বোঝাই ধান গোলাঘাটিতে। হরি সাহা আগেই পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছিল। ঘটনাস্থলে সশস্ত্র পুলিশও ছিল। তারা গুলি করে। ফলে ৭ জন মারা যায়, আরও কয়েকজন আহত হয়। দশরথ দেব ও অঘোর দেববর্মার উপরোল্লিখিত বই দুইটিতে এই লুটতরাজ ও জোর-জুলুমের ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

তখন আমরা সহরবাসীরা (আগরতলার) সহর এলাকায় বন্দী। চারদিকে ত্রাস—মহা ত্রাস। খুন-জখম-অপহরণের ত্রাস। প্রশাসনও শহরের বাইরে স্তব্ধ। পুলিশ পরোয়ানা নিয়ে যায় না। যায় না বন-তহশীল-আদালতের কর্মীরা। পূর্বদিকে রাণীর বাজার এবং উত্তর দিকে লিচু বাগান যেতেও পাঁচবার ভাবতে হত। তবে দক্ষিণ দিকে কিছু জায়গা—অন্তত; বিশালগড় পর্য্যন্ত, খোলা ছিল। এই সীমাবদ্ধতা আর ত্রাস-সন্ত্রাসের মধ্যে আমরা কাটিয়েছি প্রায় তিন বছর—১৯৪৮ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৫১-এর এপ্রিল-মে পর্য্যন্ত।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, গণমুক্তি পরিষদের সংশ্রবে বা সংগঠনে শুধুমাত্র 'ত্রিপুরী' (দেববর্মা) ছাড়া, আর কোন উপজাতি-সম্প্রদায়ই সংযুক্ত ছিল না। রিয়াং, হালাম, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, চাকমা, মগ—তারা সকলেই এর বাইরে ছিল। তাই মুক্তি পরিষদের এলাকাও ছিল শুধুমাত্র ত্রিপুরী অধ্যুষিত এলাকা—সদর, খোয়াই ও কমলপুর মহকুমার কিয়দংশ। সদর আর খোয়াই-এ-ই ছিল তাদের বেশী দাপট।

খোয়াইতে থানা আক্রমণ, অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিলিটারী শিবিরে হানা, গৃহস্থের ধান-চাল লুট ইত্যাদি ব্যাপকভাবে চলছিল। ফলে সরকার খোয়াই মহকুমায় ১৯৪৯ ইং সনের ৯ই মার্চ্চ সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করেন। তারই কিছুদিন পরে জনৈক পদস্থ অফিসার মহকুমার পদ্মবিলে পৌঁছে তাইতুং প্রথায় (বেগার খাটা) সাহায্য চাইলে, উপজাতিরা অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের দিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে সশস্ত্র আক্রমণও চালায়। পাহাড়ের আড়াল থেকেও অজস্র তীর ভেসে আসতে থাকে। তখন মিলিটারীরা গুলি চালায়। ফলে তিনজন মহিলা—কুমারী দেববর্মা, মধুমতী দেববর্মা ও রূপশ্রী দেববর্মা মারা যায়।

তাতে আন্দোলন আরও জঙ্গী হয়। সমতল আর পাহাড় অঞ্চল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু, এ অবস্থা কতদিন চলতে পারে? ধর্ম্ম-গোলা করে অন্ন যোগান যায়; কিন্তু তাদের প্রধান খাদ্য সিদল সুট্‌কি এবং লবণের কি ব্যবস্থা? আর উদবৃত্ত ফসল—তিল, কার্পাস, সরষে, ধান, তরকারী? এগুলোর কি হবে? কে কিনবে? বাজার কৈ? স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্কট দেখা দেয়। নেতৃবৃন্দও বুঝতে পারেন, এই শক্তিতে কংগ্রেস তথা ভারত সরকারকে হটান যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ, কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানার শিক্ষাও তারা এর মধ্যে পেয়ে গেছেন। সুতরাং দেশের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য তাঁরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ এর সাধারণ নির্ব্বাচনে দশরথবাবুরা সক্রিয় অংশ নেন। এবং এভাবেই অবসান ঘটে হিংসাদীর্ণ এক অন্ধকার যুগের।

* * *

নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি

হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও মুসলীম লীগের জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার ফলে এবং দেশবিভাগজনিত কারণে পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের তথা চাকলে রোশনাবাদের হিন্দুগণ, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় বা নিতে বাধ্য হয়—বারে বারে, হাজারে হাজারে। প্রথম উদ্বাস্তু আগমন ঘটে ১৯৪৬ ইং সনের অক্টোবরে, লক্ষ্মীপূর্ণিমার ২/৩ দিন পরে, নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে। দেশবিভাগের পরে, ১৯৪৭ ইং সনের ১৫ই আগষ্টের পরবর্ত্তীকালে এখানে উদ্বাস্তু আগমন ঘটে দফায় দফায়, ১৫/১৬ বছর সমানে।

আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের, প্রথমে সাহায্যের জন্য এবং পরে সাহায্য ও পুনর্ব্বাসনের জন্য গঠিত হয় সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন সমিতি—বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন স্তরে। নোয়াখালী দাঙ্গায় আগত বিশিষ্ট উদ্বাস্তুগণও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। পশ্চিম বঙ্গ থেকেও ২/১ টি সাহায্যকারী সংস্থা আসে। স্থানীয়দের মধ্যে যারা উদ্যোগ নেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দ্বিজেন দে, জিতেন পাল, চিত্ত চন্দ ও হরিকর্ত্তা (হরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মন)।

১৯৫০-এর জুনমাসে আসেন বঙ্গশার্দুল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী—ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য। উদ্বাস্তুগণ তাঁকে স্বাগতঃ জানায়,—স্বাগতঃ জানায় উদ্বাস্তু সাহায্যে গঠিত সংগঠনগুলো। একই উদ্দেশ্যে অতগুলো সঙ্ঘ-সমিতি দেখে শ্যামাপ্রসাদবাবু বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং সব সংস্থাকে একীকরণ করে কাজ করার পরামর্শ দেন। অতঃপর সব সঙ্ঘ-সমিতির সমন্বয়ে ১৩/৭/৫০ ইং তারিখে গঠিত হয় "ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সমিতি"। এর সভাপতি পদে বৃত হন প্রখ্যাত আইনজীবী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন জিতেন পাল ও ফঠিক চক্রবর্ত্তী।

উক্ত কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বসতি সমিতির উদ্যোগে ১৯৫১ ইং সনের ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ডাকা হয় সারা ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের এক মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীকে পৌরোহিত্য করার অনুরোধ জানালে, তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে পাঠিয়ে দেন তৎকালীন "ভারত" পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবী মাখনলাল সেনকে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আগরতলা দরবার মাঠে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সম্মেলনে উদ্বাস্তু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত মোট ১৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তন, উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দান, যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আদিবাসীদের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান ইত্যাদি।

এই সম্মেলনে সমিতির নূতন নামকরণ করা হয়—'ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতি' এবং এর সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে নিবারণ চন্দ্র ঘোষ ও জিতেন পাল। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—সুবোধ রায় (ধর্ম্মনগর), বিহারীলাল দত্ত (কৈলাসহর), কালীপদ ভট্টাচার্য্য (কমলপুর), নরধ্বজ সিংহ (খোয়াই), অরুণোদয় দেব (সোনামুড়া), ফনীন্দ্র প্রসাদ শূর (উদয়পুর) ও দ্বিজেন দে (সদর)।

উদ্বাস্তুদের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় ১৩।৭।৫২ ইং 'ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতির' উদ্যোগে—স্থানীয় সূর্য্যঘর সিনেমা হলে। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি নিবারণচন্দ্র ঘোষ, এডভোকেট। মোট ১৮টি

প্রস্তাব এই সম্মেলনেও গৃহীত হয়, তন্মধ্যে আসামের সহিত ত্রিপুরার সংযুক্তির বিরোধিতা অন্যতম। নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় মোট ২১ জন সদস্য নিয়ে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে এডভোকেট হেমচন্দ্র নাথ ও জিতেন পাল।

কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—যোগেন্দ্র ভূষণ পাল (ধর্ম্মনগর), যোগেন্দ্র কুমার ভৌমিক (কমলপুর), দ্বিজেন দে (সদর), রমেশচন্দ্র পাল (সোনামুড়া), ফনীন্দ্র প্রসাদ শূর ও ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় (উদয়পুর), সতীশ চন্দ্র সরকার (অমরপুর) এবং যজ্ঞকান্ত ভট্টাচার্য্য ও হেম চন্দ্র রায় (বিলোনীয়া)। এই সমিতি পরে 'সারা ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি' বা 'নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতি বা "নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি"-ই ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু-স্বার্থের একমাত্র সংগঠন, যা আগাগোড়া উদ্বাস্তুস্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গেছে। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেও, পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে তেমন সহযোগিতা করেনি; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাই করেছে। গোচারণভূমি, জ্বালানী কাঠ, জুম, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রয়োজনের প্রশ্ন তুলে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরোধিতাই করেছে বেশী। উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকারের ব্যাপারে এই দুই দলই তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছে— ১৯৫৬ ইং সনে, সংসদের ভিতরে ও বাইরে।

'নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি' তার চৌদ্দ বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামে উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার আদায় করেছে, সম্পূর্ণ ঋণ মকুব করতে সরকারকে বাধ্য করেছে; উদ্বাস্তুদের ৪৯-৫০ এর বিভেদ, টাইপ বনাম কলোনী স্কীমের বিভেদ, ব্যবসায়ী ঋণ-কৃষি ঋণের বিভেদ, ক্যাম্প উদ্বাস্তু আর বাইরের উদ্বাস্তুর বিভেদ, রিলিফকার্ড আর মাইগ্রেসান কার্ডের বিভেদ, ৫০ ইং আর ৬৩ ইং এর উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ—সংগ্রাম করে দূর করেছে।

বলা বাহুল্য, নানা বিষয়ের এই বিভেদ ছিল সরকারী তরফের। তাঁরা উদ্বাস্তুদের নানা ভাবে, নানা নামে আলাদা আলাদাভাবে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্বাস্তু সমিতি তাঁদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। জাল

মাইগ্রেসানে আগত এবং বিনিময় করে আগত ব্যক্তিদেরও নিয়মিত উদ্বাস্তু রূপে গ্রহণ করতে সমিতি সরকারকে বাধ্য করে। বস্তুতঃ, ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের, বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রায় ষোল আনা কৃতিত্বই নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতির।

নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতির এই সুদীর্ঘ কর্ম্মকাণ্ডে শেষ পর্য্যন্তও যাঁরা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন—যোগেশ চক্রবর্ত্তী (সাব্রুম), যজ্ঞকান্ত ভট্টাচার্য্য, হেম চন্দ্র রায় ও বরদাকুমার মিত্র (বিলনীয়া), সতীশচন্দ্র সরকার ও মতিলাল পোদ্দার (অমরপুর), ফনীন্দ্রপ্রসাদ সূর, ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, গোপাল ঢালী ও মহেন্দ্র মজুমদার (উদয়পুর), অরুণোদয় দেব, রমেশ পাল, চন্দ্রমোহন দেবনাথ, ব্রজেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ও সতীশ পাল (সোনামুড়া), মতি রায়, নৃপেন ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রভূষণ পাল ও কৃতেশ রঞ্জন দেব কাননগু (ধর্মনগর), বিহারীলাল দত্ত, ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য ডাঃ রাধারমন দেবরায় রামকৃষ্ণ শর্ম্মা, কেদার মালাকার ও জিতেন্দ্র আচার্য্য (কৈলাসহর), যোগেন্দ্র কুমার ভৌমিক ও অরুণ চক্রবর্ত্তী (কমলপুর), পীযুষ চৌধুরী, সতীশ মজুমদার ও চন্দ্রকুমার দাস (খোয়াই) এবং নিবারণচন্দ্র ঘোষ, জিতেন পাল, হেমচন্দ্র নাথ, অমূল্যরতন পাল, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উর্ম্মিলা মুখার্জ্জী, ইন্দ্রমোহন দেবনাথ, চিন্তাহরণ চৌধুরী, গণেশচন্দ্র সাহা, প্রেমধন দেবনাথ, রাধাকৃষ্ণ মল্লবর্মণ, নীহার নাগ, হরিমোহন দেবনাথ, সুষমা দত্তরায়, মনীন্দ্র আচার্য্য, ধনেন্দ্রচন্দ্র পাল ও সুবোধ দেব।

* * *

ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ

১৯৫১ ইং সনের ফেব্রুয়ারীর প্রায় মাঝামাঝি বংশীঠাকুর ও প্রভাত রায় আমাকে এসে জানান যে, পাহাড়ী সূত্রের নির্ভরযোগ্য খবর, দশরথবাবুরা এখন জনজীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চান এবং অবসান চান সমতল-বাসী আর পাহাড়বাসীর মধ্যে তিক্ততার বা বিভেদের। আর দ্বিতীয়তঃ দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে চান।

এই দুইটি ব্যাপারে তাঁরা আমার সক্রিয় সাহায্য কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, এই ফেব্রুয়ারীরই ৩/৪ তারিখের উদ্বাস্তু সম্মেলনে আমরা ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করি।

আমি প্রস্তাব দুইটিকেই স্বাগতঃ জানাই। হিংসাদীর্ণ অন্ধকার যুগের অবসানে সকলেরই সমান লাভ—সকলেরই শান্তি। আর দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনতো আমরা চাই-ই। এর স্বল্পকাল পরে বীরেনবাবুও (বীরেন দত্ত) এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, পাহাড়ী-বাঙ্গালী মিলনের পথে দশরথবাবুদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলে মিলে, দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে পরবর্তী ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫১ ইং) আগরতলা দরবার মাঠে (বর্ত্তমানের চিল্ড্রেন পার্ক) এক জনসভা আহ্বান করি। দলমত নির্ব্বিশেষে হাজার দেড়েক লোক তাতে উপস্থিত হন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইন-জীবী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ। ত্রিপুরায় অবিলম্বে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গঠিত হয় "ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ" নামে একটি সংগঠন সব দল-মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে।

উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন আইনজীবী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হই আমি (জিতেন পাল)। অপর কর্ম্মকর্ত্তারা ছিলেন :—অনিল চক্রবর্ত্তী (সহঃ সভাপতি) সিরাজুল ইসলাম (সহঃ সম্পাদক), গোপেশ্বর দেববর্মা (অফিস সম্পাদক), সরোজ চন্দ (গণ সংযোগ ও সংগঠন সম্পাদক), বীরবল্লভ সাহা (প্রচার সম্পাদক), হরিদাস চক্রবর্ত্তী (যানবাহন সম্পাদক) ও অশ্বিনী কুমার সিংহ রায় (কোষাধ্যক্ষ)।

আর সাধারণ সভ্যরা ছিলেন :—প্রভাত রায়, সুখময় সেনগুপ্ত, বীরেন দত্ত, বংশী ঠাকুর, হেমচন্দ্র নাথ, বীরচন্দ্র দেববর্মা, অনিল দাশগুপ্ত, রমণী দেবনাথ, প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্র দেব, অনুরূপা চক্রবর্ত্তী, হাসি রায়, গোলাম নবী ও আব্দুল মতিন। সহযোগী সভ্যরা ছিলেন—বাসনা চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মী দাস, কল্যাণী ভট্টাচার্য্য সহ আরও কয়েকজন।

সঙ্ঘের দাবী মুখ্যতঃ একটি হলেও, কাজ দুইটি। একটি প্রকাশ্য, অপরটি অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্যটি হল, পাহাড়ে-সমতলে যোগসূত্র স্থাপন করা বা পাহাড়বাসীদের মূল জনস্রোতে মিশে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। এই কারণে, দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে যতগুলো জনসভা গণতান্ত্রিক সঙ্ঘের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই হয়েছে উপজাতি অধ্যুষিত অথবা মিশ্রবসতিপূর্ণ এলাকায়. যেমন—বিশ্রামগঞ্জ, বাসকবরা পাড়া, খারিয়াথল, গোলাঘাঁটি, টাকারজলা, কাঞ্চনমালা. দুর্গাচৌধুরী পাড়া, বড় কাঁঠাল, লেম্বুছড়া প্রভৃতি। উপজাতিদের একটা ভাল সংখ্যা ঐসব মিটিং-এ উপস্থিত থাকত।

মিটিং-এর স্থান-তারিখ ঠিক করতেন বীরেন দত্ত, প্রভাত রায় বা বংশী ঠাকুর। ঐসব স্থান-তারিখে নাকি দশরথবাবুদের সায় বা অনুমোদন থাকত। বড় জনসভা করা হয় দুটি—১৫ই আগষ্ট (১৯৫১ ইং) আগরতলায় এবং ১৬ই আগষ্ট খোয়াই। খোয়াইর জনসভায় উপজাতিদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এইভাবে, বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে, ক্রমে ক্রমে পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে আবার যোগসূত্র রচিত হয়।

* * *

রাজন্য ত্রিপুরায় লোকগণনা

সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে লোকগণনা বা সেন্সাস কার্য্য আরম্ভ হয়। রাজ আমলে সেন্সাস হয় মোট ৮ বার—১৮৭২ থেকে ১৯৪১ ইং। পদস্থ রাজ-কর্মচারী ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে ১৯৩১ ইং তথা ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁর সম্পাদিত "সেন্সাস বিবরণী"তে নিম্নের তথ্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এই সেন্সাস গৃহীত হয় ১৩৪০ ত্রিং সনের ১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ ইং)।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৫.২৬২ জন। ১৮৮১ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মোট জন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৫,৬৩৭ ও

১,৩৭,৪৪২। এ সম্পর্কে ঠাকুর সাহেবের মন্তব্য,—"১৯০১ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনের পূর্ব্ববর্তী সেন্সাসত্রয়ের ফলাফল বিশুদ্ধ হয় নাই ; কারণ, তৎকালে রাজ্যের পর্ব্বত-সঙ্কুল স্থান সমূহে যাতায়াতের অসুবিধা ও লেখাপড়া জানা গণনাকারীর অভাব বশতঃ সেন্সাস কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করার পক্ষে বিস্তর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।" উল্লেখ্য,—১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক সংখ্যা যথাক্রমে ১,৭৩,৩২৫, ২,২৯,৬১৩ এবং ৩,০৪,৪৩৭ জন।

আলোচ্য সেন্সাসে অর্থাৎ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ বা ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের লোক-গণনায় ত্রিপুরার মোট লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় ৩,৮২, ৪৫০ জন। প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যার ঘনতা ৯৩ জন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তা ছিল মাত্র ৪২ জন। আলোচ্য সেন্সাসে হিন্দু ২,৬১,৫৮৯ জন, মুসলমান—১,০৩, ৭২০ জন, বৌদ্ধ ১৭,৫৩১ জন, খৃষ্টান—২,৫৯৬ জন ; এবং শিখ—১৪ জন। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল সর্ব্বমোট ১০,৮৬১ জন, তন্মধ্যে ১০,০৯৪ জন পুরুষ এবং ৭৬৭ জন স্ত্রীলোক। শিক্ষিতের হার প্রায় ২·৮%।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উপজাতিদের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৮৪,১১৭ জন। তন্মধ্যে ত্রিপুর-ক্ষত্রিয় বা পঞ্চত্রিপুরীর সংখ্যা ছিল—১,৫৩,৪৫০ জন ; হালাম—১২,৭১৩ জন ; চাকমা—৮,৬১৩ জন ; কুকী—৩,৬৫৪ জন এবং মগ—৫,৬৮৭ জন। আর মণিপুরী ছিল ১৯,২১০ জন এবং গারো ছিল ২,১৪৩ জন। উল্লেখ্য, আলোচ্য সেন্সাস রিপোর্টে গারোগণ রাজ্যের উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—"ইহারা গারো পাহাড়ের আদিম অধিবাসী, এ রাজ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করিয়াছে।"

উল্লেখ প্রয়োজন যে, ত্রিপুর-ক্ষত্রিয় বা পঞ্চ-ত্রিপুরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পুরাতন ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং ও নোয়াতিয়া। আলোচ্য সেন্সাসে তথা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় রাজ্যে পুরাতন ত্রিপুরার মোট লোক সংখ্যা ছিল—৭৭,৫৮০ জন ; দেশী ত্রিপুরা মোট ১,৪৯৪ জন ; জমাতিয়া মোট ১১,০৯০ জন ; রিয়াং মোট ৩৫,৮৮১ জন এবং নোয়াতিয়া মোট ২৭,৪০৫ জন।

আলোচ্য সেন্সাসে (১৯৩১ ইং) ত্রিপুরায় সিপাহী ছিল ৩১৫ জন ; পুলিশ কনেষ্টবল—২৬৩ জন ; চৌকিদার—৪৫ জন এবং পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন ৭০ জন। ধর্ম্মানুযায়ী লোক সংখ্যার অনুপাত ছিল—হিন্দু ৬৮%, মুসলমান ২৭%, বৌদ্ধ ৩% এবং অন্যান্য ২%। ভাষার ক্ষেত্রে—বাংলাভাষী ৪৩%, ত্রিপুরীভাষী ৩৯% এবং অন্যান্য ১৮%। জাতি-উপজাতির সংখ্যানুপাত—উপজাতি প্রায় ৪৮% এবং অ-উপজাতি প্রায় ৫২%।

রাজন্য ত্রিপুরায় শেষ সেন্সাস গৃহীত হয় ১৯৪১ ইং সনে। তাতে রাজ্যের মোট লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় ৫,১৩,০১০ জন। তুলনায় অস্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে মহারাজ সন্দিহান হন এবং তাতে আপত্তি তোলেন। সুতরাং, এই সেন্সাস বিতর্কিত থেকে যায়।

* * *

উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলাপরিষদ আইনটি প্রথম রচিত এবং গৃহীত হয় ত্রিপুরা বিধানসভায়, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে,—প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আইনটি রচিত হয় ভারতীয় সংবিধানের ৫ম ও ৭ম তপশীলের নিয়মকানুনকে ভিত্তি করে। ত্রিপুরার মোট আয়তন ১০,৪৭৮·৭৮ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে উক্ত জেলাপরিষদের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় ৭.১৩২·৫৬ বর্গকিলোমিটার। পরিষদীয় এলাকার মোট লোকসংখ্যা ছিল তখন ৪,৭২,২৯০ জন। তন্মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩,৩৭,০৭৩ জন। রাজস্ব মৌজা মোট ৪৬২টি, গাঁও পঞ্চায়েত ৪০৮ টি এবং তহশীল ১৫১ টি এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

২৮ সদস্য বিশিষ্ট এই জেলাপরিষদের প্রথম নির্ব্বাচন হয় ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী। নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং পরিষদ গঠিত হয় ১৫ই জানুয়ারী। নারায়ণ রূপিনী পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান এবং অঘোর দেববর্ম্মা ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যকরী সদস্য

নির্ব্বাচিত হন আরও পাঁচ জন। উল্লেখ্য, ২৮ আসনের মধ্যে ২১টি উপজাতির এবং ৭টি অন্যান্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

ভারতীয় সংসদে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে আগষ্ট ত্রিপুরার উপজাতি এলাকার জন্য ষষ্ঠ তপশীল বিল পাশ হয় এবং তদনুযায়ী ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলাপরিষদের নির্ব্বাচন হয় ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন। এবারও নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। নারায়ণ রূপিনী আবারও চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। অঘোর দেববর্ম্মা নির্ব্বাচিত হন মুখ্য কার্য্য-নির্বাহী সদস্য। নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন আরও ৬ জন।

ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী দ্বিতীয় নির্ববাচন হয় ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই। বামফ্রন্টকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস-টি ইউ জে এস আতাত। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জগদীশ দেববর্ম্মা, আর হরিনাথ দেববর্মা নির্ব্বাচিত হন মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য। নির্ব্বাহী সদস্য নির্ববাচিত হন আরও ৬ জন। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ তপশীলে পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। তন্মধ্যে ২৮ নির্ব্বাচিত ও ২ মনোনীত। নির্ব্বাচিত ২৮ মধ্যে ২১টি উপজাতির জন্য এবং ৭টি অ-উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিষদীয় এলাকার লোকসংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমানে এই সংখ্যা সাত লক্ষাধিক হবে।

সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশীল প্রয়োগের অন্যতম মুখ্য দাবীদার হচ্ছে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি—যার নেতৃত্বে রয়েছেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, দ্রাউকুমার রিয়াং, রতিমোহন জমাতিয়া, বুদ্ধ দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ উপজাতি নেতৃবৃন্দ। আর তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসেন ভারতের প্রয়াতা প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

* * *

ত্রিপুরায় আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(আমার জানামত এবং ১৯৫৪ ইং পর্য্যন্ত)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় আসেন চারবার। প্রথম আসেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে(১৮৯৯-১৯০০ খৃঃ) এবং শেষবার আসেন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (সূত্র—"শতাব্দির ত্রিপুরা"—রমাপ্রসাদ দত্ত)।

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ কয়েকবারই ত্রিপুরায় আসেন। তিনি প্রথম আসেন ১৯৪৭ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে।

গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ দুইবার ত্রিপুরায় আসেন। প্রথমে ১৯৪৮ ইং সনের আগষ্ট মাসে এবং পরে ২৫/৫/৫০ ইং তারিখে। শেষবার তাঁর সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কররাও দেও ও ছিলেন।

বেলুড় মঠ-মিশনের স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ প্রথম ত্রিপুরায় আসেন ১৯৪৮ ইং সনের প্রথমভাগে। পরে ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজ আবার আসেন উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে।

বেলুড়মঠ মিশনের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ ত্রিপুরায় আসেন ৪/৬/৫০ ইং উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য।

বঙ্গ-শার্দুল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ত্রিপুরায় আসেন ২২/৬/৫০ ই উদ্বাস্তু পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে এবং জ্যোতি বসু প্রথম ত্রিপুরায় আসেন ২/১২/৫১ ইং প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড অজয় ঘোষ ত্রিপুরায় আসেন ৩০/১২/৫১ ইং—নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন ত্রিপুরায় আসেন ১১/১/৫১ ইং।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথম ত্রিপুরায় আসেন ২৪শে অক্টোবর, ১৯৫২ ইং।

প্রজাসমাজতন্ত্রী-নেতা এন জি গোড়ে প্রথম ত্রিপুরায় আসেন ১৫/১১/৫২ ইং নিজ দলীয় কার্য্যে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু প্রথম ত্রিপুরায় আসেন ৩০/১১/৫২ ইং।

আর এস এস-এর ষড়সঙ্ঘচালক শ্রীমাধবরাও গোলওয়ালকর ত্রিপুরায় প্রথম আসেন ১০/৩/৫৩ ইং।

শান্তিনিকেতনের উপাচার্য্য জ্ঞানতপস্বী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ত্রিপুরায় আসেন ১/২/৫৯ ইং।

ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় দুইবার আসেন। প্রথমে ১৯৫৩ ও পরে ১৯৬১ ইং সনে—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে। (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা।)

প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আগরতলায় আসেন ৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩ ইং—বিশ্ব যুব সম্মেলনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করতে।

বেলুড় মঠ ও মিশনের সহঃ সভাপতি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ, অসীমানন্দ মহারাজ সহ ৩রা জুন, ১৯৫৪ কুমিল্লা থেকে ত্রিপুরায় আসেন।

* * *

রেল মানচিত্রে ত্রিপুরা

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা ভারতের রেল মানচিত্রে প্রথম স্থান লাভ করে ১৯৬৪ ইং সনে। ঐ সনের ২২শে এপ্রিল ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ধর্ম্মনগর রেলষ্টেশনে কলকলিঘাট—ধর্ম্মনগর রেলপথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই রেল-পথই ত্রিপুরার প্রথম এবং একমাত্র রেল-পথ,—যা বর্ত্তমানে কুমারঘাট পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৪ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকেই উক্ত রেলপথটি চালু হয়। তখন থেকেই ২/১টি করে গাড়ী এই পথে চলাচল করতে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২২শে এপ্রিল। এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য সাড়ে উনিশ মাইল। তন্মধ্যে আসাম এলাকায় ১২ মাইল, আর ত্রিপুরায় সাড়ে সাত

মাইল। ত্রিপুরার মাটিতে তখন তিনটি ষ্টেশন—চোরাইবাড়ী, নদীয়াপুর ও ধর্ম্মনগর। কুৰ্ত্তি নদী অতিক্রম করে রেলপথটি ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। রাজধানী আগরতলা থেকে চোরাইবাড়ীর দূরত্ব প্রায় ১২৯ মাইল।

উক্ত সাড়ে উনিশ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণে মোট ব্যয় হয় দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। টাকার যোগান দেন রেলবোর্ড। কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬১ইং সনের নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ১৯৬৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে। রেল-পথটি নির্ম্মিত হয় মিটার গজ মেন লাইনের মান অনুযায়ী। এই রেল-পথ উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত।

* * *

ত্রিপুরার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তথ্য

(মোটামুটি ১৯৫৩ ইং পর্য্যন্ত)

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পোষ্ট অফিসটি স্থাপিত হয়েছিল আগরতলায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর। (সূত্র—শতাব্দির ত্রিপুরা, রমাপ্রসাদ দত্ত)

রাজ-সরকারের প্রথম ছাপাখানার নাম ছিল "বীরযন্ত্র"। মহারাজ বীর-চন্দ্রের আমলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠাকাল—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেরও আগে। আর একটি ছাপাখানাও ছিল চাকলার প্রয়োজনে। (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—শিক্ষা বিভাগ।)

রাজধানীতে থেকে পার্বত্য ছাত্রদের পড়া-শোনার ব্যবস্থা প্রথম করা হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে—মাসিক পাঁচ টাকা হারের বৃত্তিতে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন—শিক্ষা বিভাগ।)

ঠাকুর বোর্ডিং-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রচেষ্টায়। (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা।)

সরকারী মুখপত্র "ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক রূপে, বাংলায়। পরবর্ত্তী বছরে মাসিক রূপে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের

ডিসেম্বর অবধি একরূপই থাকে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে নাম পাল্টিয়ে হয় "ত্রিপুরা গেজেট" এবং ভাষা হয় ইংরেজী। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)

১৩১৩ ত্রিং সনের (১৯০৩ ইং) ২৬শে কার্ত্তিক রাত্রিতে আগরতলা কলেজ ও হাইস্কুলের ঘরগুলো অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দেওয়া হয় (সূত্র—ঐ)

রাজ্যে চা-বাগান প্রথম স্থাপিত হয় ১৩২৬ ত্রিং বা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথম চা বাগান—কৈলাসহরের হীরাছড়া চা-বাগান। (সূত্র—১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণী।)

সোনামুড়া হাইস্কুলের নাম "এন্ সি ইনষ্টিটিউসন" হয় ১লা ভাদ্র, ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭ইং) থেকে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন।)

রাজ্যের প্রথম লটারীর নাম "ত্রিপুরা চ্যারিটি লটারী"। প্রথমে মাত্র একটি পুরস্কার ছিল এবং তার মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠাতা—মহারাজ বীরবিক্রম। সময়—অনুমান ১৯২৯—৩০ খৃষ্টাব্দ।

রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় ১৩৪২ ত্রিং সনের (১৯৩৩ইং) ১লা মাঘ থেকে।

৺অমর ভট্টাচার্য্যের অমরসুধায় ডাকাতি হয় (রাজনৈতিক ডাকাতি) ১৯৩২ইং সনে এবং গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন্দ্র দত্ত, পবিত্র পাল ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী।

রাজ্যের রিয়াংদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় ১৯৩৪—৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই। ১৯৩৫ ইং সনের ভাদ্র মাসের গেজেটে তার উল্লেখ আছে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন।)

ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ ইং সনের এক ঘোষণায় রাণা বোধজঙ্গকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তখন রাণা সাহেব ত্রিপুরা সরকারের চীফ সেক্রেটারী। (সূত্র—ঐ)

আগরতলার বর্ত্তমান পাওয়ার হাউস, "আগরতলা ষ্টেট গ্যারাণ্টিড্ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী" নামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে।

ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ ফ্যাক্টরী "মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরী" নামে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আগরতলা, কলেজ টীলার পূর্ব্বাংশে স্থাপিত হয়।

ধর্ম্মনগরে 'হিতসাধনীসভা' স্থাপিত হয় ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে—গয়া প্রসাদ ত্রিবেদী, করুণাময়নাথ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে। উদ্দেশ্য—জনকল্যাণ ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে জনজাগরণ। (সূত্র—ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি—তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত)

রাজ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে—শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, হরিগঙ্গা বসাক, তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, নীলু মুখার্জ্জী প্রমুখের নেতৃত্বে। (সূত্র—ঐ)

১৩৫০ ত্রিং সনের (১৯৪০ ইং) ১লা বৈশাখ থেকে রাজ্যে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সৃষ্টি হয়। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন।)

মুসলমানদের একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান "আঞ্জুমান ইসলামিয়া" গঠিত হয় ১৯৪১ ইংরেজীতে আব্দুল বারিক খান (গেদু মিঞা), সিরাজুলহক চৌধুরী (প্যারা মিঞা) প্রমুখের নেতৃত্বে 'মুসলীম লীগের' ভেদ-বুদ্ধির বা হিন্দু-বিদ্বেষের অনুকরণে।

"ত্রিপুরা দরবার" "ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট"—এ রূপান্তরিত হয় ৯ ৬.৪২ ইং তারিখের এক ঘোষণায়। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন)।

রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয় ৬ ৯।৪২ ইং তারিখের এক নোটিফিকেশনে। (সূত্র—ঐ)।

রাজ্যের ঐতিহাসিক রিয়াং-বিদ্রোহ 'রতনমুনির-বিদ্রোহ' হয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে। ঐ বিদ্রোহের ফলে রতনমুনি প্রাণ হারান। (সূত্র—ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি—তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত।)

আগরতলার ঠাকুর পল্লী হাই স্কুল "বোধজঙ্গ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়" নামে ঘোষিত হয় ২৭।২ ৫৫ ত্রিং সনের (১৯৪৫ ইং) এক সরকারী আদেশে। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন।)

"মহারাজগঞ্জ বাজার' নামকরণ করা হয় আগরতলার দৈনিক বাজারকে, ১৩৫৫ ত্রিং সনের (১৯৭৫ ই°) ১৬ই কার্ত্তিকের এক নির্দ্দেশে। সূত্র—ঐ)।

"সাহিত্য বাসর" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। তার আগের নাম ছিল 'ত্রিপুরা কৃষ্টি সংসদ'।

মহারাজ বীর বিক্রমের উদ্যোগে, ত্রিপুরীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার মানসে "ত্রিপুর সঙ্ঘ" গঠিত হয় ১৯৪৬ ইংরেজীতে। ঠাকুর ললিতমোহন দেববর্ম্মন তার সভাপতি এবং সুধন্ব দেববর্মা তার সম্পাদক পদে বৃত হন। (সূত্র—ত্রিপুরায় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর—অঘোর দেববর্মা।)

ত্রিপুরায় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম ইউনিট গঠিত হয় ১৯৪৬ ইং সনের মাঝামাঝি। সম্পাদক পদে বৃত হন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। (সূত্র—ত্রিপুরার গণ আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিকথা—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত।)

১৮।৪।৪৭ ইং মহারাজ বীরবিক্রম, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী গিরিজাশঙ্কর গুহকে ভারতীয় গণ পরিষদে ত্রিপুরার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দিল্লীতে তারবার্ত্তা পাঠান। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন।)

ত্রিপুরার বর্ত্তমান সময় (ঘড়ি) প্রবর্ত্তিত হয় ১লা আশ্বিন, ১৩৫৭ ত্রিং (১৯৪৭ ইং) থেকে। (সূত্র—ঐ।)

ত্রিপুরায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় ১৩৫৭ ত্রিং (১৯৪৭ ইং) সনের ২রা আশ্বিন। (সূত্র—ঐ)

গান্ধীজীর জন্মদিবসে ত্রিপুরায় প্রথম ছুটি ঘোষিত হয় ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ইং। (সূত্র—ঐ)

নেতাজীর জন্মদিনে ত্রিপুরায় প্রথম সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ইং সনের ২৩শে জানুয়ারী। (সূত্র—ঐ)।

নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে বিনানুমতিতে সভা করার অভিযোগে পুলিশ লাঠিচার্জ করে গ্রেপ্তার করে তার উদ্যোক্তাদের। গ্রেপ্তার হন সুখময় সেনগুপ্ত প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী, অনিল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ আরও অনেকে। ঘটনা —২৩।১।১৯৪৮ইং। (সূত্র—তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত)।

১৯৪৯ ইং সনের জানুয়ারী মাসে খাদ্য আন্দোলনের ছাত্র-সমাবেশে উমাকান্ত একাডেমীর মাঠে পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে। তাতে প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী, অনিল ভট্টাচার্য্য, সরোজ চন্দ আতিকুল ইসলাম, বাসনা চক্রবর্ত্তী প্রমুখ আহত হয়। (সূত্র—তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত)।

১৯৪৯ইং সনের ৯ই মার্চ্চ খোয়াই বিভাগে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তখন দেওয়ান বি কে আচার্য্য।

১৯৪৯ ইং সনের নভেম্বর মাসে "ত্রিপুরা সাংবাদিক সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠিত হয় অভ্যুদয়, চিনিহা, জনকল্যাণ, ইতিহাস ও ত্রিপুরা রাজ্য পত্রিকা—এই পাঁচটি পত্রিকা নিয়ে এবং এই সঙ্ঘই ত্রিপুরার প্রথম সাংবাদিক সঙ্ঘ। প্রথম অস্থায়ী সম্পাদক ঠাকুর প্রভাত রায় (চিনিহা)।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সহরতলীর আনন্দনগরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্র 'রামকৃষ্ণ কলোনী' স্থাপিত হয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে। উক্ত মিশনের ভারপ্রাপ্ত স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজকে এ ব্যাপারে নিরলস ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা সাহায্য করেন, ফটিক চক্রবর্ত্তী ও কানুগোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁদের মধ্যে অন্যতম

রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার 'বিভাগ' সমূহ 'মহকুমায়' রূপান্তরিত হয় ত্রিপুরার প্রথম চীফ কমিশনার রঞ্জিৎকুমার রায়ের ২৫/১/৫০ইং এর নোটিফিকেশনে।

বর্ত্তমান স্থানে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ গত ২৩/১/৫০ইং।

চম্পকনগরে "লোক শিক্ষালয়" এর প্রতিষ্ঠা—৭/২ '৫০ইং। প্রথম অধ্যক্ষ—ঠাকুর ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ।

রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গত-চিকিৎসা মহারাজগঞ্জ বাজার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ১৭/৩ ৫০ইং থেকে। স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

আগরতলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা—১৫/২/৫৭ বাং (মে, ১৯৫০ ইং)। প্রধান অতিথি স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রথমে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর বনমালীপুরের ভগবান ঠাকুর বাড়ীর নিকটস্থ এক পুকুর পাড়ে পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে আশ্রমটি উঠে আসে বর্ত্তমান স্থানে—গাঙ্গাইল রোডে। এর প্রতিষ্ঠাতা পরম ভক্তপ্রবর অনন্তলাল বণিক।

নিখিল মহারাজ তথা নিখিল ব্রহ্মচারী, আরও তিনজনের সঙ্গে শেখেরকুটে অস্ত্র-আইনে গ্রেপ্তার ও জেলহাজতে প্রেরিত হন ১৯৫০ ইংরেজীর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই নিখিল মহারাজই পরবর্ত্তীকালে কোনাবনে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

"ত্রিপুরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমিতি" প্রথম গঠিত হয় ১৯৫০ইং সনের জুন মাসে। এর প্রথম সভাপতি—ঠাকুর ললিতমোহন দেববর্মণ এবং যুগ্ম সম্পাদক রামতারণ ভট্টাচার্য্য ও মনোমোহন ঘোষ।

রাজ্যে প্রথম বনমহোৎসব বা বৃক্ষরোপণ উৎসব : ১—৭ জুলাই, ১৯৫০ ইং।

'গণমুক্তি পরিষদ' কম্যুনিষ্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। নবগঠিত এই ইউনিটের সম্পাদক হন রাখাল রাজকুমার। তখন বীরেন দত্ত ও অঘোর দেববর্মা জেলে। (সূত্র "মুক্তি পরিষদের ইতিকথা" —দশরথ দেব।)

নৃপেন চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পর ১৯৫০ ইংরেজীর মাঝামাঝি ত্রিপুরায় আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ডাঃ বিজয় বসু ও বিপুল চৌধুরী (মোহন চৌধুরী)। (সূত্র—ঐ)।

১৯৫১ ইং সনের ১লা মার্চ সমাজ বিরোধীরা (গণমুক্তি পরিষদের) প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার বায়ে সিধাই থানা লুট করে। ৮টি রাইফেল এবং কয়েকশত কার্টিজ তারা নিয়ে যায়। ৪ জন কনেষ্টবল আহত হয়।

"দোকান কর্ম্মচারী সমিতি" প্রথম গঠিত হয় ১৯৫১ ইং ফেব্রুয়ারী-মার্চে

১৯৫১ ইংরেজীতে গাঙ্গাইল রোডস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দুর্গাপূজার হিসাব :—মোট চাঁদার পরিমাণ তথা মোট আয় ৩৯৯'৫০ পয়সা এবং মোট ব্যয় ৩৯৯'৫০ পয়সা।

চাকলা রোশনাবাদ জমিদারী পাকিস্তান সরকার অধিগ্রহণ করেন ১৭/১১/৫১ ইং। ক্ষতিপূরণ—৭০ লক্ষ টাকা, ৪০টি বার্ষিক কিস্তিতে দেয়।

রাজ্যে জনসঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ ইং সনের নভেম্বর মাসে

ত্রিপুরার প্রথম লোকসভার নির্ব্বাচন : কেন্দ্র—২, ত্রিপুরা পূর্ব্ব ও ত্রিপুরা পশ্চিম ; প্রার্থী—৭, পূর্ব কেন্দ্রে শচীন্দ্রলাল সিংহ (কংগ্রেস), দশরথ দেব (কম্যুনিষ্ট) ও নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (জনসঙ্ঘ) এবং পশ্চিম কেন্দ্রে সুকুমার চক্রবর্ত্তী (কংগ্রেস), বীরেন দত্ত (কম্যুনিষ্ট), মহারাজকুমার দুর্জ্জয় কিশোর দেববর্মণ (নির্দল) ও বিনয় গাঙ্গুলী (জনসঙ্ঘ) ; ভোট হয় ১৯৫২ ইংরেজীর ১১, ১৬ ২১ ও ২৭ জানুয়ারী ; উভয় আসনেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থী বিজয়ী হন ; পূর্ব্ব কেন্দ্রে দশরথ দেব এবং পশ্চিম কেন্দ্রে বীরেন দত্ত

লোকসভা সদস্য দশরথ দেব আত্মপ্রকাশ করেন ১৩/৫/৫২ ইং দিল্লীতে। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত মোকদ্দমা ও বিধিনিষেধ ঐ দিনই প্রত্যাহৃত হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) সঙ্গে পাসপোর্ট প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন ২/১০/৫২ ইং

আগরতলা সহরে শেষ জঙ্গলী হাতীর মারাত্মক উৎপাত কলেজটিলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ২৩/১০/৫২ ইং। এতে তিনজন নিহত হয়।

ত্রিপুরার প্রথম ব্লক—জিরানীয়া কম্যুনিটি প্রজেক্ট : প্রতিষ্ঠাকাল ২৪/১০/৫২ ইং : প্রতিষ্ঠাতা—ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

রাজ্যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের ইউনিট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে "মানুষ" পত্রিকার সম্পাদক কমলারঞ্জন তলাপাত্রের নেতৃত্বে। পরবর্ত্তী নেতৃত্বে ছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকমল রায়, সত্যপ্রসাদ দাস জিতেন পাল, বীরেশ চক্রবর্তী, গোপীবল্লভ সাহা, দিলীপ রায়, হেমেন্দ্রবিজয় রায়, গোপাল কর প্রমুখ।

অরুন্ধতীনগরের বর্ত্তমান পুলিশ লাইন ও হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১/১২/৫২ ইং : স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস নাথ কাটজু।

"ত্রিপুরা প্রেস কর্ম্মচারী সমিতি" প্রথম গঠিত হয় ২৭/৫/৫৩ ইং।

আগরতলায় প্রথম পাক-ভিসা অফিসের উদ্বোধন ১৯/১০/৫৩ ইং, ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লিঃ এর (বর্ত্তমান কংগ্রেস ভবন) দ্বিতলে।

কমরেড মোহন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয় ২/১১/৫৩ ইং বিশালগড়ের রাঙ্গাপানিয়া অঞ্চল থেকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ—২ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কম্যুনিটি প্রজেক্টের ব্যয় এর মধ্যে ধরা হয়নি।

ত্রিপুরা বিধানসভার প্রথম অধিবেশন—২৫শে জুলাই, ১৯৬৩ ইং।

ত্রিপুরায় প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন—১/১১/৭১ ইং ; কার্য্যকরী হয় ৩/১১/৭১ ইং থেকে।

কুঞ্জবনস্থ "রাজনিবাস"—এর নাম "রাজভবন" হয় ২১/১/৭২ ইং থেকে।

ত্রিপুরার প্রথম চীফ কমিশনার—রণজিৎকুমার রায়, আই সি এস ; প্রথম উপরাজ্যপাল এ এল ডায়াস, আই সি এস এবং প্রথম রাজ্যপাল—বি কে নেহেরু, আই সি এস।

* * *

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্র

(৺ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের "রাজমালা" হইতে সংগৃহীত ;
পৃষ্ঠা—১৬৫-৬৬)

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুজাকে বন্দী করে পাঠাবার জন্য দিল্লীর দরবার থেকে নানা তদ্বির আসতে থাকে। তারই প্রেক্ষিতে গোবিন্দ মাণিক্য আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে নিম্ন পত্রটি পান। পত্রটি ফার্সী ভাষায় লিখিত। এর বাংলা অনুবাদ করেন উমাকান্ত একাডেমীর তৎকালীন হেড মৌলবী সিরাজুল ইসলাম।

"অদ্বিতীয় উজ্জ্বলমণি বংশজ বিষম-সমর-বিজয়ী
পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ গোবিন্দ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর—

জগদীশ্বর আপনার রাজ-শাসন অক্ষুণ্ণ রাখুন !

আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের পৈত্রিক শত্রু সুজা গুপ্তভাবে আপনার রাজ্যে অবস্থান করিতেছে। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা ও স্বীয় ক্ষমতানুসারে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বন্ধুতা ও একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরাতন কালে আফগাণ বংশ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মুক্ত কৃপাণ সম্মুখে পলায়ন করতঃ আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইলে, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত একতা ও বন্ধুতার বলে ঐ হতভাগ্যগণকে পূর্ববাংলা হইতে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে বিপদাপন্ন করতঃ স্বদেশ অভিমুখে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে গৌড়ের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং পাঠানেরা ত্রিপুরেশ্বর হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।)

সুতরাং আশা করি, বর্ত্তমানে আমাদের লেখা অনুযায়ী উল্লিখিত শত্রুকে বন্দী করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রেরণ করিবেন। যদি মহারাজের অনুমতি হয় তবে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষকে মুঙ্গের জেলাতে উপস্থিত থাকিয়া অপেক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিব। অন্তঃপর তাহাকে (সুজাকে ধৃত করিলে বিশেষ

যত্ন ও সতর্কতা সহকারে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের হাওয়ালা (অর্পণ) করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করতঃ পুরাতন জাবেতা অনুযায়ী বন্ধুত্বের শৃঙ্খল দৃঢ় করিবেন। নতুবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস, যদি সেই অপরিণামদর্শী আপনার রাজ্যে অবস্থান করে তবে নিশ্চয়ই রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, পুরাতন বন্ধুতা অনুযায়ী উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

নিবেদক—
আলমগীর শাহ
দিল্লীর সম্রাট।"

* * *

'রাজর্ষি' উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে মহারাজ বীরচন্দ্রের জবাব

॥ শ্রীহরি ॥

সদ্‌গুণান্বিতেষু—

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই। আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি, মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মত এরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়

ধর্ম্মমাণিক্য 'জীবান্বিবসুমোন' ত্রৈপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন আর কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে। তৎপূর্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাঙ্গালা রাজমালা লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বাঙ্গালা কবিতায় কেবল ৺কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উহার নাম 'কৃষ্ণমালা'। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবনচরিতের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের ফলক ও সনদ-পত্রাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়—আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা হইলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত ধর্ম্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তিকলাপের

চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানেরও ইতিহাস জানাইতে পারিব।

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর, তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করান হইয়াছে। সত্বর ছাপান যাইতে পারে কিনা, উদ্যোগ করিতেছি। মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে 'রাজর্ষির' কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাহা রাজরত্নাকরের উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রাজরত্নাকর ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজা দৈত্য প্রভৃতির জীবন-চরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল—সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত সুন্দর। সেই অংশ অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাময় সংবাদ দানে সুখী করিবেন, ইতি। ১২৯৬ ত্রিপুরা, তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রণত

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা

(সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—পৃষ্ঠা২২/২৩)

* * *

মহারাজ বীরবিক্রমকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

১৩৪৮ বাংলার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ৮০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ বীরবিক্রম "রবীন্দ্র-জয়ন্তী-দরবার" আহ্বান করেন এবং ঐ দরবারে কবিকে "ভারত ভাস্কর" উপাধিকে ভূষিত করেন। ৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় রাজদূত মহারাজের খোবকারী পাঠাস্তে কবির হস্তে, মহারাজের নামাঙ্কিত মোহর সহ তা অর্পণ করেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় কবির প্রত্যুত্তর পুত্র রথীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। প্রত্যুত্তর—

"ত্রিপুরা রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে, তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল এই, লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি নূতন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলঙ্কৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম, এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব-সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তা হয়নি।

কবি-বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। তিনি

আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেননি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি, যদিচ রাজ-সান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধ দ্বারা কণ্টকিত। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন, পাছে আমাকে কোন গোপন অসম্মান আঘাত করে এমন কি, তিনি আমাকে নিজে স্পষ্টই বলেছেন, আপনি আমার চারিদিকের পারিষদদের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। এ কারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন, কোন বাধাকেই আমি গণ্য করিনি।

যে অপরিণত-বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সঙ্কুল ছিল, তার সঙ্গে কোন রাজত্ব-গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সেই রাজবংশের এই সম্মান যুক্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে বর্তমান মহারাজ অত্যাচার-পীড়িত বহু সংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম, তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হলো। এর সঙ্গে বঙ্গ-লক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্ব্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে।

এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল। এবং এই দিনে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্ব্বাদ করি, এই মহা পুণ্যের ফল মহারাজের জীবন-যাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্ব্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবি জীবনের অন্তিম শুভ কামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহা নৈঃশব্দের মধ্যে শান্তি লাভ করুক।"

[৺ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের রাজমালা থেকে—পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৯]

আরও কিছু তথ্য

(ভুলবশতঃ যথাস্থানে দেওয়া হয়নি)

রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে. কমলারঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, দ্বিজেন দে, মহারাজ কুমার কর্ণকিশোর দেববর্মণ, অনিল দাশগুপ্ত প্রমুখের নেতৃত্বে। পরবর্তীকালে আসেন বকুল কর, সতীনাথ ভরদ্বাজ, গোপীবল্লভ সাহা, নীরবল্লভ সাহা, ব্রজগোপাল রায়, ইন্দুভূষণ সাহা সহ আরও অনেকে

'কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সমিতির' সদর বিভাগীয় কমিটি প্রথম গঠিত হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সদস্যগণ ছিলেন—শরৎচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি), রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (সহঃ সভাপতি). হরিপদ কর (সহঃ সভাপতি), ডাঃ রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক). ডাঃ শান্তিরঞ্জন শূর (সহঃ সম্পাদক), জিতেন পাল, দ্বিজেন দে, ফটিক চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনী কুমার সিংহ রায়, জিতেন্দ্র চৌধুরী, হেমচন্দ্র নাথ, চিত্ত চন্দ, যোগেশ চক্রবর্তী, বৃন্দাবন চন্দ্র নাথ ও রাখাল দাস (সভ্য বৃন্দ)

গাঙ্গাইল রোডস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় ৪/১১/৫১ ইং নিম্নোক্ত ভক্তবৃন্দকে নিয়ে :—

স্বামী মহানন্দ মহারাজ (সভাপতি), নিবারণচন্দ্র ঘোষ (সহঃ সভাপতি) চিন্তাহরণ মজুমদার (সহঃ সভাপতি), অনন্তলাল বণিক (সম্পাদক), ক্ষিরোদ মোহন লোধ (সহঃ সম্পাদক), বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (হিসাব রক্ষক) এবং সুকুমার গুহ, কান্তিরঞ্জন ঘোষ রায়, জিতেন পাল কালীপ্রসন্ন দত্ত, নীলরতন গাঙ্গুলী, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিশচন্দ্র ধর (সভ্যবৃন্দ)

রাজ্যে জনসঙ্ঘ প্রথম গঠিত হয় (নভেম্বর, ১৯৭০ ইং) নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বিনয় গাঙ্গুলী প্রমুখের নেতৃত্বে। পরবর্তীতে নেতৃত্বে আসেন পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, অমূল্য রতন পাল, জীবন ব্যানার্জী, রমানাথ চক্রবর্তী, ডাঃ ননী চক্রবর্তী, ব্রজেশ চক্রবর্তী, হরেন্দ্র কিশোর রায় বর্মণ, সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেকে

কিছু সংশোধন : তথ্যের ও মুদ্রণ-প্রমাদের

সংশোধন অপরের পরিবেশিত কিছু তথ্যের এবং আমার এই পুস্তকের মুদ্রণ-প্রমাদের। কয়েকজন লেখক তাঁদের নিজ নিজ পুস্তকে কিছু ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। এগুলো এখনই সংশোধিত না হলে পরবর্তী কালে এস্টাব্লিস্‌ড্‌ হয়ে যাবে এবং এই ভুল বা বিকৃত তথ্যকেই প্রামাণ্য তথ্য ধরে ভবিষ্যতে লেখক, গবেষক বা ঐতিহাসিকগণ অগ্রসর হবেন।

প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীঅঘোর দেববর্মা তাঁর "ত্রিপুরায় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর" শীর্ষক পুস্তকে মন্তব্য করেছেন,— "সামন্ততান্ত্রিক আমলে জনশিক্ষা সমিতির আগ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন উপজাতি এলাকায় প্রাথমিক স্কুল পর্য্যন্ত ছিল না।" (পৃষ্ঠা—৭৪) একথা মোটেই সত্য নয়। জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। আর আমি রাজ-সরকারের স্কুল সাব-ইন্‌সপেক্টার ছিলাম ১৯৪১—৪৪ খৃষ্টাব্দে। সদর এবং দক্ষিণের বিভাগসমূহ ছিল আমার এলাকা। তখন উপজাতি বা মিশ্র বসতি এলাকায় নিম্নের স্কুলগুলোতো ছিলই, আরও বেশী হয়তো ছিল :—

সাব্রুম মধ্য ই°, ঘোড়াকাপা, বকুল, মুহুরীপুর নিং বাং, ফয়েজপুর, বাঞ্ছারাম রোয়াজা পাড়া, যাত্রাপুর নিং বাং, জুমের ঢেপা, অম্পিনগর নি° বা°, অমরপুর মধ্য ই°, গামাইরবাড়ী, মাতারবাড়ী, বিশ্রামগঞ্জ, খারিয়াথল, গোলাঘাটি, কেনানীয়া, জিরানীয়া নিং বাং, রাধামোহনপুর, মহেশপুর, দুর্গাচৌধুরী পাড়া নি° বা°, উত্তর দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর, সীমনা, মাণ্ডব কিল্লা, পাট্টাবিল প্রভৃতি

দশরথবাবু তাঁর "মুক্তি পরিষদের ইতিকথা"য় লিখেছেন, ১৯৫২ ইং সনের ইলেক্টরেল কলেজের নির্ব্বাচনে মোট ৩০টি আসনের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি— ১৭, গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ—৩, সমর্থিত নির্দ্দল—১ এবং কংগ্রেস—৯টি আসন পেয়েছে। তা ঠিক নয়। ঠিক হচ্ছে, কম্যুনিষ্ট পার্টি—১২, গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ —৩, কম্যুঃ সমর্থিত নির্দ্দল—২, কংগ্রেস—৯ এবং নির্দ্দল—৪। এই নির্দ্দলরা কোন দলেরই সমর্থিত ছিলেন না এবং নির্বাচন শেষে তাঁরা সকলেই কংগ্রেস দলে মিশে যান।

সাংবাদিক সমীরণ রায় সম্পাদিত "তথ্যপঞ্জী ও নির্দ্দেশিকা"র ৩য় সংস্করণের ৭ম পৃষ্ঠায় ১৯৪৮ ইংরেজীর গোলাঘাটির ঘটনাকে "কৃষক বিদ্রোহ" বলে বলা হয়েছে। তা মোটেই ঠিক নয়। তা ছিল তীব্র বাঙ্গালী-বিদ্বেষ প্রসূত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের ধান লুট এবং পরিকল্পিতভাবে। দশরথবাবু এবং অঘোর দেববর্মার উপয়োক্ত বই দুইটিতেও তার ইঙ্গিত রয়েছে।

উক্ত তথ্যপঞ্জীর ৮ম পৃষ্ঠায় ১৯৫১ ইং সনের আগরতলা পুরসভার নির্বাচনে "১৬ জন কমিশনার নির্বাচিত" বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। মোট আসন ছিল ১৮ এবং ১৮ জনই নির্বাচিত হন। এর ই ৪১ পৃষ্ঠায় প্রাক্তন দেওয়ান প্রসঙ্গে এক নম্বরে এ বি চাটার্জীর নাম বলা হয়েছে। তা ঠিক নয় এক নম্বরে হবেন রাজারত্ন সত্যব্রত মুখার্জী, আই সি এস। রিজেন্সী আমলের উনিই প্রথম দেওয়ান। দ্বিতীয় দেওয়ান এ বি চাটার্জী, আই সি এস

এই তথ্যপঞ্জীর ৪২ পৃষ্ঠার ৭ম লাইনে লিখিত "৩ জন মন্ত্রী ও ১ জন উপমন্ত্রী" কথাটি ঠিক নয়। বাজপ্রসাদ চৌধুরী, বিনোদ বিহারী দাস এবং মণীন্দ্রলাল ভৌমিক—এই তিনজনই ছিলেন শচীনবাবুর প্রথম মন্ত্রীসভায় উপমন্ত্রী। মন্ত্রী ছিলেন একমাত্র সুখময় সেনগুপ্ত। শচীনবাবুর দ্বিতীয় মন্ত্রী-সভায় মনসুর আলী ছিলেন উপমন্ত্রী; মন্ত্রী নন। এই বই-এর তাও ভুল

সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভায় শৈলেশ সোম, মনসুর আলী ও বাসনা চক্রবর্তী এই তিনজনই প্রথমে উপমন্ত্রী ছিলেন। উক্ত তথ্যপঞ্জীর লেখা-মত রাষ্ট্রমন্ত্রী নন। পরে পুনর্গঠনে তাঁরা রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। নির্বাচন, আসন-সংখ্যা এবং মন্ত্রীসভা সম্পর্কিত উপরোক্ত সমস্ত সংশোধনের ভিত্তি আমার সম্পাদিত অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'জনকল্যাণ' ও দৈনিক 'জাগরণ' পত্রিকা

সম্প্রতি ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় "প্রেক্ষাপট" এর ৩য় লাইনে বলা হয়েছে,—"উপজাতি জনসংখ্যা ১৯৩১ সালে ছিল ৫০ ১৫% ..." তা মোটেই ঠিক নয়। ১৯৩১ সালে ত্রিপুরায় উপজাতি জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৮%। ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা সম্পাদিত '১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণী" দেখুন।

এই সব ভুল বা বিকৃতির জন্য আমি কাউকে অভিযুক্ত করছিনা মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় এবং কোন বিবরণে ভুল থাকতেও পারে। এই সব ভুলের জন্য শুধু লেখকই দায়ী নন: মুদ্রণ-প্রমাদ তথা ছাপার ভুলও এজন্য অংশতঃ দায়ী। আমার এই পুস্তকেও কিছু ছাপার ভুল রয়েছে, —যেমন ১৬ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে "সংস্কার ঘোষণা" হয়ে গেছে "ঘোষণা সংস্কার"; ৫০ পৃষ্ঠার ৯ম লাইনে "ফটিক" হয়ে গেছে "ফঠিক": ৫৮ পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে ১৯৪৬ হয়ে গেছে ১৯৪৭; ৭২ পৃষ্ঠার ৩য় লাইনে 'উপাধিতে' হয়ে গেছে 'উপাধিকে'। আর আমার নিজের ভুলে কানু ব্যানার্জী হয়ে গেছেন কানু মুখার্জী —৪০ পৃষ্ঠার ২৩ লাইনে।